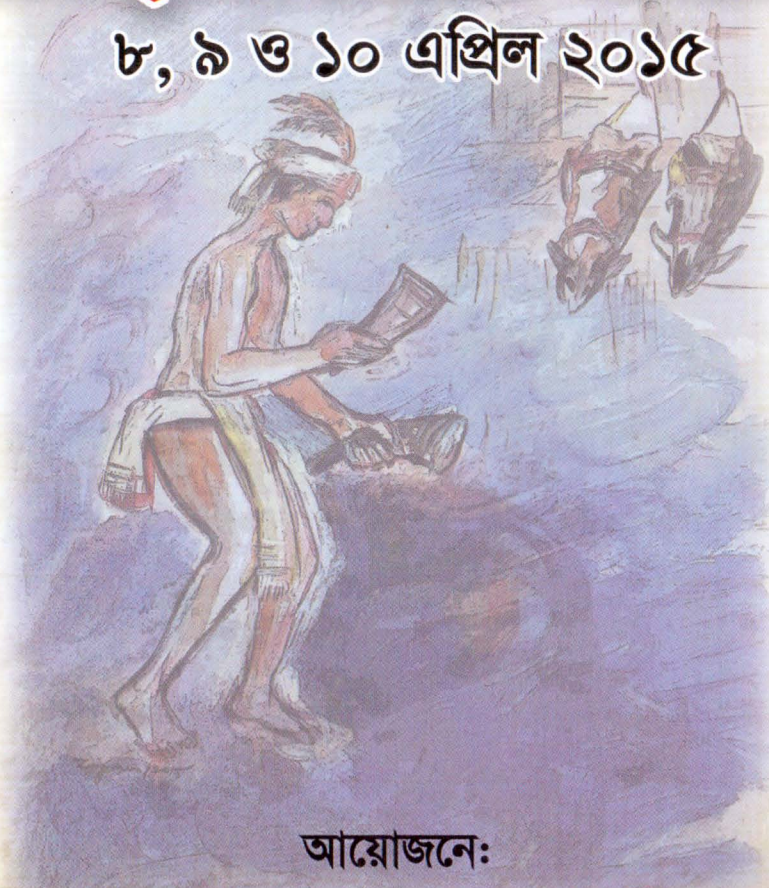




# পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা ২০১৬

৮, ৯ ও ১০ এপ্রিল ২০১৫



আয়োজনে:



জুম ইসথেটিক্স কাউন্সিল (জাক)



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ট্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

# ১৪ তম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা- ২০১৫

৮, ৯ ও ১০ এপ্রিল

সম্পাদক : অম্লান চাকমা

স্থান : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গন, রাঙামাটি  
আয়োজনে : জুম ইন্সটিটিউটস কাউন্সিল (জাক), রাঙামাটি

# ১৪ তম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা

স্মরণিকা ২০১৫

## সম্পাদনা পর্ষদ

আহবায়ক : অম্লান চাকমা

সদস্য : শিশির চাকমা

সদস্য : মৃত্তিকা চাকমা

সদস্য : রনেল চাকমা

সদস্য : জিংমুন লনচেও

## প্রচ্ছদ

আর. চাঙমা

## প্রকাশকাল

৮ এপ্রিল ২০১৫

## প্রকাশনায়

জুম ঈস্‌থেটিক্স কাউন্সিল (জাক)

ত্রিদিব নগর সড়ক, বনরূপা

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

ফোন : ০৩৫১-৬৩৫৪২

ই-মেইল : [ldpdp@yayadp.com](mailto:ldpdp@yayadp.com)

## ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নান্দনিক চেতনাগুলোকে ধারণ, লালন ও বিকাশের লক্ষ্যে জুম ঈস্থেটিক্স কাউন্সিল (জাক) এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কাজ করে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংগঠনটি ১৯৯৮ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা আদিবাসী জাতিসমূহের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে একই মঞ্চে ধারণ করার প্রয়াস রেখে চলছে। উক্ত সালেই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা সংগঠনটির উদ্যোগে আয়োজিত হয়। এই বছর অনুষ্ঠানটির ১৪তম আসর।

এবারের পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলায় বম আদিবাসী সম্প্রদায়কে পাদপ্রদীপের আলোয় রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সবর উপস্থিতিও মেলাপ্রাঙ্গণকে প্রাণচঞ্চল রাখবে প্রত্যাশা করি।

এবারের মেলাটির আয়োজন করতে গিয়ে প্রতি বছরের মতো এ বছরও আমরা অনেক বন্ধুর সহযোগিতা পেয়েছি। তারা আমাদের সামনের পথ চলতে সাহস জুগিয়েছেন। তাদেরকে আমরা কৃতজ্ঞতার বাঁধনে বাঁধছি।

১৪তম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা-২০১৫ এর প্রতিপাদ্য বিষয় “রিনাফুং, ট্র, টিংটেং ও শিঙায় বেজে উঠুক আদিবাসী জীবনের গান”। রিনাফুং, ট্র, টিংটেং ও শিঙা শুধুমাত্র বাদ্য নয়, আমাদের স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়ের হাতিয়ারও বটে। আমরা চাই এই হাতিয়ারের মঞ্চেই উজ্জীবিত হোক আদিবাসী জীবনের প্রাত্যহিক সাংগ্রামগীতি।

পরিশেষে, ১৪তম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা-২০১৫ এর সফলতা কামনা করছি।

# আদিবাসী সংস্কৃতি মেলার উদ্বোধনী সংগীত

রচনা ও সুর : তরুন চাকমা (মনিবো)

## চাঙমায়

হিল্ চাদিগাঙর থল্ আ মুরোয়  
এগারবো জাদ জুম্ম জাদ ইধু আঘিই  
আমামায়-নেই রিজেরিজি  
আমিই-আমি আদিবাসী ॥

এগ্ সুধোত্ গাদেয়ে ধক্  
আমি আঘিই আমি থেবং ।  
এগ্ আঝা, আমা স্ববন  
এগ্ ধেলাত্ আমি ফুদেবং ।  
আমি ফুদেবং-আমি ফুদেবং আহঝি আহঝি ॥

মুরো থল্ আ ছড়া নালে  
জুম্ম সংস্কৃতি বিলি আঘে ।  
এ সংস্কৃতি থুবেই আমি  
পিন্ডিমীমায় সিধেবং বেগে ।  
সিধেবং বেগে-সিধেবং বেগে আহঝি আহঝি ॥

## বাংলায়

হিল চট্টলার পাহাড় আর সমতলে  
এগার জাতি জুম্ম জাতি মোরা আছি  
মোদের মাঝে নেই রেষারেষি  
মোরাই-মোরা আদিবাসী ॥

একি বৃন্তের ফুলের মতো  
মোরা আছিই, মোরা থাকবো ।  
মোদের আশা, মোদের স্বপ্ন  
একি ডালেতে মোরা ফুটাবো ।  
মোরা ফুটাবো-মোরা ফুটবো এই প্রত্যাশী ॥

পাহাড়, সমতল, ঝর্ণা ধারায়  
জুম্ম সংস্কৃতি বিলিয়ে আছে ।  
এ সংস্কৃতি কুড়িয়ে মোরা  
ছড়িয়ে দেবো সারা বিশ্বে ।  
ছড়িয়ে দেবো-ছড়িয়ে দেবো এই প্রত্যাশী ॥



# বম

জির কুং সাহ

## ১। বসতি, অঞ্চল ও জনসংখ্যা

জাতিবৈচিত্র্যের এক সমৃদ্ধ অঞ্চল আমাদের এই পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিন জেলার বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর, নানা সংস্কৃতির এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভার আমাদের অহংকার। ভিন্ন ভাষাভাষী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বম অন্যতম।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও ভারতের উত্তর-পূর্বঞ্চলে এবং মায়ানমারের চীন প্রদেশে বম জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বঞ্চল রাজ্যগুলোর মধ্যে বম জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে মণিপুর ও মিজোরাম রাজ্যে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি ও বান্দরবান সদর উপজেলায় এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিলাইছড়ি উপজেলায় ৭০টি গ্রামে বমরা বসবাস করে। সরকারি পরিসংখ্যানে বম জনগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে বম জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যা ৬,৯৭৮ জন বলে উল্লেখ রয়েছে। তবে বমরা সরকারি পরিসংখ্যান যথাযথ নয় বলে মনে করে। ২০০৩ সালে বম সোশাল কাউন্সিল বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুসারে বম আদিবাসির জনসংখ্যা ৯,৫০০।

দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী এই অরণ্যচারী বম জনগোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে এখনো অনেক পেছনে। ভৌগোলিক অবস্থান ও দূরত্বের জন্য এরা উন্নয়ন সুযোগ হতে বঞ্চিত। বছরের অধিকাংশ সময় গভীর অরণ্যে শিকারে এদের সময় কাটে। শিকারি স্বভাবজাত গহীন অরণ্য এবং পাহাড়ি ঝরনার পানি প্রভৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়া প্রকৃতি প্রেমিক এ জনগোষ্ঠী কালের পরিবর্তনের ধারায় বর্তমানে নানা হুমকির মধ্যে রয়েছে।

### ১.১। “বম” জনগোষ্ঠীর নামকরণ

বম আদিবাসী কুকি-চিন ভাষাভাষী মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত। “বম” শব্দের অর্থ বন্ধন, বা মিলন, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, একত্ৰীভুক্ত, এক করা বা হওয়া। আদিম প্রথার জীবন প্রণালী যেমন: বন্যপ্রাণী শিকারের জন্য একস্থান হতে অন্যস্থানে পরিভ্রমণ, গোত্রীয় প্রাধান্যের লড়াই, উপগোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ প্রভৃতির কারণে তারা বিভিন্নকালে দলচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে গহীন অরণ্যে আর দুর্গম পাহাড় পর্বতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্তির ফলে তারা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাই ক্রমে ক্রমে দুর্বল ও সংখ্যায় কমতে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে একত্ৰীভুক্ত করা বা সংযুক্ত করণের ফলে “বম” শব্দের প্রচলন হয়েছিল। আচার-অনুষ্ঠান, রীতি নীতি, আহার-পানীয়, সঙ্গীত-নৃত্য ও পূজা-পার্বণ ইত্যাদি প্রায়ই একরূপ। সেই গোত্র বা গোত্রী অর্থ-ভাবে বা একটি সমষ্টিগতভাবে একক রূপে নিজেদের আখ্যায়িত করার ফলে “বম” শব্দের উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়।

বম শব্দের উৎপত্তি এবং অর্থ নিয়ে নানান মত বিদ্যমান। জির কুং সাহ এবং এস এল পারদৌ বম শব্দগত অর্থ এবং তার সম্ভাব্য প্রয়োগ এভাবে দিয়েছেন, the word Bawm literally meaning, with the noun, ‘coop, cage, container, or basket’ does not contribute seriously to answer why they retained the name by which they called themselves....with the verb, ‘Bawm’ meaning, ‘unite, to become one ‘merge, absorption in greater whole, share of partake with others’....sound better to explain the origination of the term literally (Shahu and Pardo : 1998 :1-2)এস এল পারদৌ মনে করেন বোন-জো Bonzu, Banjoogec, Bounjwes, Bounj-Jus, Banjogus ev Banjogi বমদের প্রকৃত নাম বমজৌ (Bawm-Zo) এর অপ্রভ্রংশ (Shahu and pardo : the Bawms : the Forest Wandering tribe of Chittagong Hill Tracts, ১৯৯৮)। আর লালনাগ বম মনে করেন যে ‘বমজৌ’ শব্দ থেকে ‘বম’ শব্দের উৎপত্তি। (লালনাগ বম : উপজাতি পরিচিতি, বম : অক্টুর ১৯৮১)

ব্রিটিশ ও অন্য লেখকেরা বমদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। যেমন : বনজো (বুকানন ১৭৯৮), বনযোগী (ম্যাক্‌কোয়া ১৮০১), বুনজোস (বারবে ১৮৪৫), বৌনজুস এবং বৌনজিস (পিয়াও ১৮৪৫) <sup>১</sup> আরো অনেকে, যেমন : লুইন, ম্যাক্‌জি, ওয়ে, রীবেক, হাচিনসন, মিলস, লেভি স্ট্রাউস, বাসানেত, বারনোটস প্রমুখ লেখকেরা বনযোগী বা বানযোগী (বার্বি), বম ও বম-জো (লোরেন ১৯৪০), বোম-লাইজো এবং বোম (বারনোটস), বোম-জো (লোফলার, ১৯৫৯), বনযোগী এবং বোম (সোফার, ১৯৬৪), বম (ওলফগং মে, ১৯৬০) আর বোম (প্রামাণিক) শব্দটি উল্লেখ করেছেন। <sup>২</sup> Banjoogee, Banjoos, Banjous, Bounjwes, Banjogis, Banjogics ইত্যাদির বহু রূপী ইংরেজি বানানের বাংলা 'বনযোগী'। এই বনযোগীই বমদের বেলায় সর্বাধিক ব্যবহার হতে দেখা যায়। হাচিনসন (১৯০৬ : ১৫৯) এর ব্যাখ্যায় The name Banjogi is derived from 'ban' a forest, and 'jogi' wanderer তার অর্থ forest wandering tribe। 'বন' (Ban) এবং 'যোগী' (jogi) শব্দ দুটির কোনটি বমদের নিজস্ব নয়। একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে বিবিধ নামে অভিহিত করার ঐতিহাসিক কারণ হয়তো আছে তবে Bawm, Bom, Bom-Zo, Bawm-Zo, Zo, Lai, Laimi (বানানের প্রকারান্তরে) ছাড়া অন্য নামগুলো নিজেদের বেলায় কখনো ব্যবহার করেনি।

বম জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বাস করে বান্দরবান জেলায়। এ জেলায় রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি ও বান্দরবান সদর থানায় তারা বসবাস করেন। এছাড়া রাঙ্গামাটি জেলায় বিলাইছড়ি থানায়ও এদের আবাস আছে। দুই জেলার মোট পাঁচটি থানায় ৬৫টি গ্রামে বমদের বসবাস রয়েছে।

## ১.২ বম জনগোষ্ঠীর বর্তমান বসতি

ক্রম	গ্রাম	মৌজা	ইউনিয়ন	থানা	জেলা
১.	বান্দরবান	পৌরসভা	বান্দরবান	বান্দরবান	বান্দরবান
২.	লাইমি	বান্দরবান	এ	এ	এ
৩.	কানা	বান্দরবান	এ	এ	এ
৪.	হেব্রন	বালাটা	এ	এ	এ
৫.	ফারুখ	সোয়ালক	সোয়ালক	এ	এ
৬.	শ্যারণ	এ	এ	এ	এ
৭.	গেটশিমান	এ	এ	এ	এ
৮.	লাইলুনপি	এ	এ	এ	এ
৯.	সালেম	আলেক্ষ্যং	আলেক্ষ্যং	রোয়াংছড়ি	এ
১০.	চিনলুং	কলাক্ষ্যং	কলাক্ষ্যং	বান্দরবান	এ
১১.	ত্ৰাং নুয়াম	এ	আলেক্ষ্যং	রোয়াংছড়ি	এ
১২.	কেরসে ত্ৰাং	এ	এ	এ	এ
১৩.	লুংলেই	ক্ষানক্ষ্যং	রোয়াংছড়ি	এ	এ
১৪.	ক্যা প্রাং	ক্ষানক্ষ্যং	এ	এ	এ
১৫.	পান ক্ষ্যংপান	ক্ষ্যং	এ	এ	এ
১৬.	সোয়ানলু	রোয়াংছড়ি	এ	এ	এ
১৭.	দূর্নিবার	ক্রা উ	তারাছা	এ	এ
১৮.	গিল গাল	এ	এ	এ	বান্দরবান
১৯.	কানান	পাইন্দু	পাইন্দু	রুমা	এ
২০.	বাম ত্ৰাং	খামংখ্যং ক্ষ্যং	এ	এ	এ
২১.	জুর ভারং	এ	এ	এ	এ
২২.	ফিয়াং পিদুং	এ	এ	এ	এ
২৩.	মুনরেম	এ	এ	এ	এ



ক্রম	গ্রাম	মৌজা	ইউনিয়ন	থানা	জেলা
২৪.	জুরপি	এ	এ	এ	এ
২৫.	গাইজাম	এ	এ	এ	এ
২৬.	সিপ পি	খামংখ্যং	পাইন্দু	রুমা	এ
২৭.	মুননোয়াম	এ	এ	এ	এ
২৮.	আর্থা	এ	এ	এ	এ
২৯.	বাসা ভ্রাং	দাক্র ক্ষ্যং	এ	এ	এ
৩০.	এলিম	এ	এ	এ	এ
৩১.	মুয়ালপি	এ	এ	এ	এ
৩২.	চাইরাগ্র	পলি	রুমা	এ	এ
৩৩.	বেথেল	এ	এ	এ	এ
৩৪.	রুমা বাজার	এ	এ	এ	এ
৩৫.	এডেন	এ	এ	এ	এ
৩৬.	লাইরুনপি	এ	এ	এ	এ
৩৭.	মুনলাই	কলা দে	এ	এ	এ
৩৮.	নাজারেথ	কলা দে	এ	এ	এ
৩৯.	ভ্রাং নোয়াম	সেংগুম	এ	এ	এ
৪০.	বগালেক	রুমা	এ	এ	এ
৪১.	সাইকত	রুমা	এ	এ	এ
৪২.	দার জিলিং	রুমা	এ	এ	এ
৪৩.	লুং থাউসি	রুমা	এ	এ	এ
৪৪.	রুমানা	রেমাগ্রি প্রানসা	রেমাগ্রি প্রানসা	এ	এ
৪৫.	সুনসং	এ	এ	এ	এ
৪৬.	থিং দলতে	এ	এ	এ	এ
৪৭.	সালৌপি	এ	এ	এ	এ
৪৮.	চেইক্ষ্যং	এ	এ	এ	এ
৪৯.	থেইক্ষ্যং	এ	এ	এ	এ
৫০.	পাইজল	রেমাগ্রি	রেমাগ্রি	এ	এ
৫১.	তাম-লৌ	রেমাগ্রি প্রানসা	রেমাগ্রি প্রানসা	এ	এ
৫২.	যাদীপাই	পারদা	বলি পাড়া	এ	এ
৫৩.	বাকভ্রাই	পারদা		এ	এ
৫৪.	সের কর	পারদা		থানচি	এ

## ৩৯০. বাংলাদেশের আদিবাসী”

ক্রম	গ্রাম	মৌজা	ইউনিয়ন	থানা	জেলা
৫৫.	সিমত্ভাংপি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫৬.	প্রাতা	পারদা	থানচি	থানচি	ঐ
৫৭.	থাং দুয়াই	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫৮.	শাজাহান	কোয়াই ক্ষ্য	ঐ	ঐ	ঐ
৫৯.	বেথলেহেম	পলি	রুমা	রুমা	ঐ
৬০.	নিউমডেল	পারুয়া	পারুয়া	বিলাইছড়ি	ঐ
৬১.	জাইঅন	পলি	রুমা	রুমা	ঐ
৬২.	মুনথার	রোয়াংছড়ি	রোয়াংছড়ি	রোয়াংছড়ি	ঐ
৬৩.	দৌলিয়ান	তারাছা	রোয়াংছড়ি	রোয়াংছড়ি	ঐ
৬৪.	মডেল	আলেক্সাং	আলেক্সাং	রোয়াংছড়ি	ঐ
৬৫.	রামথার	ঘেরাও	রোয়াংছড়ি	রোয়াংছড়ি	ঐ

## ২. ঐতিহাসিক পটভূমি

পূর্বকার প্রতিবেদনগুলোয় বমদেরকে ‘বনযোগী’ (Bonjoogees) বানজুস’ (Bunzoos) ‘বৌংজুস’ (Boung-Jus) বা ‘বৌনজুস’ (Boung-Jews) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লুইন, ম্যাকেঞ্জি, উয়ে, রিবেক, হাচিনসন, মিলস্, লেভি স্ট্রাউস, বেসাইনেট এবং বার্নটসহ ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন আদমশুমারি এবং অন্যান্য লেখকগণ যারা নতুন তথ্য প্রদানে স্থলে মূলত লেউইনের রচনাবলি বিন্যস্ত করেছেন এবং তারা এই গুপকে ‘বনযোগী’ (Banjugis) ‘বুনযোগিস’ (Bunjugis) বা তজ্জাতীয় নামে জানেন। বার্বি ‘বম’ নাম উল্লেখ করেছেন, ঠিক যে নামে বম সম্প্রদায় নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। লোরেন বম বা ‘বম-জৌ’ (Bawm or Bawm-Zo) নামে লিপিবদ্ধ করেছেন। বার্নট নামকরণ করেছেন ‘বম-লাই জৌ’ বা ‘বম’ (Bawm-Lacjo or Bawm) হিসাবে। লফলার ‘বম-জৌ’ (Bawm-Zo) বলেছেন এবং সোফার ‘বনযোগী’ এবং ‘বম’ (Bonjogi and Bom) বলে উল্লেখ করেছেন। চীন ভাষার মাপকাঠির বিচারে যেসব লেখক ‘বম’ জনগোষ্ঠীকে ‘কুকি’ (Kuki) বা ‘চীন’ (Chin) বলে জোর দাবি করেছেন তাদের মধ্যে লেউইন, রিবেক, গ্রিয়ারসন, হাচিনসন, উফেনেডেন, শ্যাফার প্রমুখ অন্যতম।

উনবিংশ শতকের পূর্বে এবং বিংশ শতকের বিভিন্ন লেখালেখিসমূহে বমদেরকে চীন (Chin) জাতির উপশাখা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ফায়ের, বার্বি, লুইন,গ্রিয়ারসন, হাচিনসন, মিলস্ ও অন্যান্য লেখকগণ অনুরূপ মত পোষণ করেন। শব্দাবলি ও বৈচিত্র্যতা যা চীন জাতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয় এমন বিশেষত্ব ছাড়াও তারা বম জাতির স্বকীয় শ্রেণিভেদ উপস্থাপনপূর্বক তাদের মতের স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন।

বমদের আদি নিবাস নিয়ে নানা রকম কাহিনী প্রচলিত আছে। বলা হয় চীনের চিনলুং এলাকার এক গুহা থেকে তারা এসেছে। ধারণা করা হয় এই কাহিনী মনে রাখার জন্য বান্দরবান জেলার একটি বম গ্রামের নাম চিনলুং রাখা হয়েছে। এতদ্বিষয়ে একটি বহু প্রচলিত গীত :

কা পা লাম ত্রাক আ ঠান দাং  
সিনলুং লাম ত্রাক আ ঠান দাং

অনুবাদ :

আমার পিতার পদপাত অতি চমৎকার  
সিন লুং পদপাত অতি চমৎকার।

বর্তমান স্থানে বমদের আগমন সপ্তদশ দশকে। ফ্রান্সিস বুকানন দক্ষিণপূর্ব বাংলায় (কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম) তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে চমৎকার ঐতিহাসিক ঘটনাবলি উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৮ এপ্রিল ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে বাজালিয়া (বোমাং হাট) নামক স্থানে তাঁর খাটিয়ে অবস্থান কালে ৬ জন 'জৌ নারীপুরুষের দেখা পান।

### ৩. সামাজিক সংগঠন

#### ৩.১ গোত্র ও পরিবার

বমরা সুনথলা (Sunthla) এবং পাংহয় (Panghawi) এই দুইটি গোত্রে বিভক্ত। এই দুই প্রধান প্রধান গোত্রের আবার অনেক উপদল ও গোত্র রয়েছে যেমন :

**সুনথলা (Sunthla):** জাহাও, জাখাং, চিনজা, লনচেও, চেওরেক, সিয়ারলন, সানদৌ, তেনু, বয়ত্নোং, থিলুম, ভানদির, লনসিং, লাইতাক, চেওলাই, দয়ত্নোং, হাওহেং, তৌনির, লালনাম, থেলয়াখাং, মিলাই, মারাম, থাংতু, রুয়াললেং, ক্ষেংলত, লেইহাং, আইনে, লাইকেং।

**পাংহয় (Panghawi):** সাইলুক, পালাং, রোখা, সাতেক, রুপিচাই, সাখং, তিপিলিং, সামখাং, থাংমিং, সাংলা, কমলাউ, সাহ, পংকেং, লেংতং, নাকো, আমলাই, থাংথিং, বুইতিং, ডেমরং, তালাকসা, মিলু, চারাং, খুয়ালরিং, সানথিং, রেমপেচে, মিত, ইচিয়া, কংতোয়া।

ইদানিং বমরা তাদের নামের আগে বা পরে গোত্রের নাম লিখতে শুরু করেছেন। যেমন: এস লনচেও, জির কুং সাহ, জুয়ামলিয়ান আমলাই ইত্যাদি। বিশিষ্ট দুই বম নেতা পরদৌ এবং দৌলিয়ান তাদের নামের পূর্বে গোত্রীয় নাম লেখার প্রচলনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যেমন: পারদৌ লেখেন এসএল পারদৌ, এস এল মানে সাইলুক আর দৌলিয়ান লেখেন এল দৌলিয়ান। এল মানে লনচেও। নামের আগে গোত্রের নাম ব্যবহারের চেয়ে বর্তমানে নামের পরে গোত্রের নাম ব্যবহার জনপ্রিয় হচ্ছে।

বম পরিবারের প্রধান ব্যক্তি হলেন পিতা। পিতার দিক থেকেই সন্তানদের বংশ গণনা করা হয়। বমদের একই গোত্রে বিয়ে হয় না। নিজেদের গোত্রের বাইরে বিয়ে করতে হয়। বিয়ের ব্যাপারে ছেলে মেয়েরা মা বাবার সিদ্ধান্তই মেনে নেয়। তাদের মধ্যে বিধবা বিয়ের প্রচলন আছে। নারীরা সংসারের সকল কাজ করে ও পুরুষদের কাজে সাহায্যতা করেন। জুম চাষ, কাঠ কাটা ও কাঠ সংগ্রহেও তারা সহায়তা করেন। মেয়েদেরও হাট-বাজারে বেচা কেনা করতে দেখা যায়।

#### ৩.২ সামাজিক প্রথা

১৯১৮ সন হতে বম জনগোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়াতে বর্তমানে এদের ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক রীতি-নীতিতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বম সমাজের প্রাচীন রীতি-নীতি, প্রথা ও ঐতিহ্যেও সমন্বয়ে বম সমাজের নেতৃবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে ১৯৮৫ সালে বম সোস্যাল কাউন্সিল গঠন করে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ গ্রামেই সালিশের মাধ্যমে মিমাংসা করা হয়। সামাজিক বিচার সালিশের জন্য 'বম ডান বু' নামে বম সমাজ আইনের বই প্রকাশ করেছে। এই বইয়ের আইনি নিয়মনীতি তারা কঠোর ভাবে মেনে চলে। বমরা স্বভাবে বিনম্র। তাদের মোলায়েম ভাষার বিশ্রী রকম গালাগালের শব্দটি পর্যন্ত অনুপস্থিত। নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি, চুলাচুলি বা মারামারির ঘটনা বিরল। তাদের সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিও খুবই সুদৃঢ়। সামাজিক আচার-আচরণ, বিচার শালিস এবং বিবাদ মীমাংসার জন্য যে সামাজিক অবকাঠামো রয়েছে তা অত্যন্ত প্রাণবন্ত, নির্মল, যা সামাজিক সংহতি রক্ষণে, ঐক্য ও কল্যাণ সাধনে বম সমাজকে সম্বলিত করে এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক আচরণ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বম সমাজের কেউ এই যাবত নিজেদের মধ্যে সংঘটিত কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য কোর্ট বা অন্য কোন সরকারি সংস্থার শরণাপন্ন হয়েছে বলে যানা যায় না। সামাজিক আচার-আচরণ, বিচার শালিস ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বম সমপ্রদায় ১৯৪৮ সালে প্রথম (Bawm Dan Bu - Bawm Customary Law) নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করে। একে বম জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংবিধান বলাচলে যার নির্দেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে আপামর বম জনগোষ্ঠী মেনে চলে। এই সংবিধানটি সর্বশেষ ১৯৯৫ সালে সংশোধনী আকারে মুদ্রিত হয়। একটি জনগোষ্ঠীর সকল কৃষ্টি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের শিকড় হচ্ছে এই সামাজিক আইন। সুষ্ঠু সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থার জন্য প্রথাগত সামাজিক আইন অপরিহার্য। স্মরণাতীতকাল থেকে বম আদিবাসি জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব এ প্রথাগত সামাজিক আইন দিয়ে জীবন ধারা পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু কালের বিবর্তন ধারার সাথে সমন্বয়যোগী পরিবর্তন না হওয়ায় এ প্রথাগত সামাজিক আইনসমূহ প্রয়োজে বিভিন্ন সমস্যা, সংকট দেখা দিচ্ছে।

### ৩.৩ প্রথাগত আইনের উৎস

বম জনগোষ্ঠীর সামাজিক আইন প্রধানত তাদের সামাজিক রীতি প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বম জনগোষ্ঠী তাদের সামাজিক, পারিবারিক গোত্রগত শৃঙ্খলা এবং শাসন সংহত রাখতে সমাজের সর্বজনগ্রাহ্য বিশেষ কিছু নিয়ম, রীতি-নীতি ও প্রথা অনুসরণ করে। আদিবাসী বম সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি ও প্রথাসমূহকে সমাজের বিকাশ ও বিবর্তনের ধারায় বর্তমানে বম সমাজের নেতৃবৃন্দ এসব আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বিচার-সালিশ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথম (Bawm Dan Bu) অর্থাৎ বম প্রথাগত আইন নামে এক খাতা পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। যা পার্বত্য জেলাসমূহে বসবাসকারী আদিবাসী সমাজে একটা ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। বম জনগোষ্ঠী ১৯৯৫ সনে ইধসি উধহ ই কে সংশোধন করে।

পার্বত্য এলাকায় বম সমাজ ব্যবস্থায় অদ্যাবধি জুম চাষ তাদের প্রধান পেশা। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪২ বিধিতে জুম চাষের জন্য জমির মালিকানা স্বত্ত্বের প্রয়োজন হয় না, যার কারণে বম সমাজে স্থাবর সম্পত্তির তথা ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তি বা স্থানীয় মালিকানা স্বত্ত্ব অর্জনের প্রচেষ্টা তেমন একটা ছিলনা বলেই চলে। এ অবস্থায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পার্বত্য জেলাসমূহে বসবাসকারী বম সমাজে অতীতে তেমন একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। ইদানীংকালে জুম চাষের জন্য নতুন নতুন জমির অপ্রতুলতা এবং পর্যায়ক্রমে এই জমিতে বংশানুক্রমিকভাবে অবস্থানের কারণে বম জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্যান কৃষির প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি বর্তমান শিক্ষিত সমাজে ভূ-সম্পত্তির উপর স্থায়ী মালিকানা স্বত্ত্ব অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা উদ্ভব হয়েছে।

বম পরিবারে কেউ মারা গেলে তার সৎকার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের বেলায় সামাজিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সমাজে অনুশাসন অনুসারে মৃতের আত্মার সদগতির জন্য বিশেষ কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার হতে হয়। বম সমাজে সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পর মৃতের সৎকার, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পাদনের পর তার অনাদায়ী ঋণ, জীবদশায় সম্পত্তি উইল বা দানমূলে দখল হস্তান্তরিত হয়েছে কিন্তু মালিকানা স্বত্ত্ব স্থানান্তরিত হয়নি এমন ভূ-সম্পত্তির দায়ী/দাবি মেটানোর পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার উপরই উত্তরাধিকারগণের দাবি/অধিকার বর্তায়।

### ৩.৩ সম্পত্তি বন্টন

বম সোস্যাল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মতে, সম্পদশালী স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তার স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি হতে ২৫%-এর আইনগত উত্তরাধিকার লাভ করবে। তবে বিধবা তার মৃত স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে যদি দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় সেক্ষেত্রে পূর্বের স্বামীর সম্পত্তির ২৫% অংশ লাভের অধিকার হারাবে।

বম সমাজের কন্যা সন্তানেরা বম সোস্যাল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্তমানে মৃত পিতার অবস্থাবর সম্পত্তিতে মাতার অনুরূপ ২৫% ভাগের আইনগত উত্তরাধিকার লাভ করবে।

পুত্র সন্তানেরা মৃত পিতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সিংহভাগ লাভ করবে। তবে মৃত পিতার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির বৃহৎ অংশের উত্তরাধিকারী হয়।

### ৩.৪ অর্থনৈতিক সংগঠন

বম জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন ঐতিহ্যগত উৎপাদন ব্যবস্থা যা জুম চাষ নামে অধিক পরিচিত। বমরা সাধারণত সমতল ভূমিতে বাস করে না। গিরিচূড়ায়, উচু পাহাড়-পর্বতে, গভীর অরণ্যে তাদের বসবাস। বন্য জন্তু-জানোয়ার ও পশুপাখি শিকারে তারা নিপুণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ৭২.৯% ভূমি খাড়া পাহাড় ও পর্বত বিধায় ভূ-তত্ত্ববিদদের মতানুযায়ী তাতে কেবল বন করার উপযোগী। পার্বত্য অঞ্চলে জুম চাষ একসময় অতি নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকর অবলম্বন ছিল। ফলনও হতো প্রচুর। সারা বছরের ধান, মরিচ হতো আর অর্থকরী হিসাবে কার্পাস তুলা, তিল প্রচুর উৎপন্ন হতো। তুলা উৎপাদনের জন্য পার্বত্য অঞ্চলকে তৎকালে ‘কার্পাস মহল’ বলা হতো। এককালে যে পাহাড় প্রচুর ফলন দিত সে পাহাড় আজ উৎকর্ষহীন, শীর্ণকায়, রুক্ষ এবং ন্যাড়া। জুম চাষের অনেক অসুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন- একই পাহাড়ে পর পর চাষ করা যায় না। এক চাষের পর পরবর্তী চাষের জন্য কমপক্ষে ৩ থেকে ১০ বছর অপেক্ষা করতে হয়। পাহাড়কে বিশ্রাম দিতে হয় যাতে গাছ গাছালি, লতা-গুল্ল জন্মে এবং মাটিকে উর্বর করে। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বনায়ন কার্যক্রমের জন্য জুম চাষের পাহাড় কমে গেছে। জনসংখ্যার চাপ, জুম চাষের ক্রমেৎপাদন এবং নির্ভরযোগ্যতার কারণে জীবিকার বিকল্প উপায় হিসাবে কাঠ আহরণ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এই অবাধে কাঠ আহরণ পার্বত্য অঞ্চলের বনজ সম্পদ উজাড়করণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেই চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূ-প্রাকৃতিক কারণে ভূমির উর্বরতা ও চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যত ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা দেশের অপরাপর অঞ্চল হতে বেশি।

বিপর্যয়োন্মুখ অর্থনীতি এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসাবে ফল চাষের জন্য জোর প্রচালনা চালান হয় বম সমাজে। জীবন নির্বাহে নির্ভরযোগ্য উপায় হিসাবে ফলদ চাষকে চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে বম পরিবারগুলো নেমে আসতে থাকে নদীর নিকটবর্তী পাহাড়ে, অপেক্ষাকৃত সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা বা বাজারের নিকটবর্তী এলাকায়।

রুমা উপজেলার ১ থেকে ১০ কি.মি. এর মধ্যে গড়ে উঠে উল্লেখযোগ্য বম বসতি। যেমন : বেথেল, এডেন, লাইবুনপি, মুনলাই, বেথলেহেম, নাজারেথ ও ত্রাংনুয়াম পাড়াসমূহ। এখানে ৩৩১ বম পরিবার ফল চাষ করে জীবন ধারণ করছে। বান্দরবান জেলা শহরের নিকটবর্তী পাহাড়ের বম বসতি ১৯৮০ সালের দিক থেকে শুরু হয়েছে। চিম্বুক রোডে গড়ে উঠেছে লাইমি, ফারুক, লাইলুনপি, শারণ ও গেটশিমানী পাড়া ইত্যাদি আর বালাগাটা ও মেঘলার কাছাকাছি আরো ৪টি বম পাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাড়ার নামগুলো হলো হেব্রন, চিনলুং ও কানা পাড়া। রোয়াংছড়ি ও থানচি উপজেলার কাছে আরো ৪টি বম বসতি গড়ে উঠেছে। এই তথ্যানুযায়ী ৭৩৭ পরিবার পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে জুম চাষ পরিত্যাগ করে নির্দিষ্ট বন্দোবস্তকৃত পাহাড়ে ফল চাষ করে জীবনধারণ করছে, যা বম জনগোষ্ঠীর ৩৮%।

আশির দশকের এই নবউদ্যোগকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বম পরিবার স্বাগত জানায়। বাগান করার জন্য নির্দিষ্ট পাহাড়/ভূমি নিজ নামে বন্দোবস্তি নেওয়া শুরু করে। নতুন জায়গায় নিজ নামে পাহাড় বন্দোবস্তি নেওয়ার এই উদ্যোগ/প্রচেষ্টা শুধুমাত্র নতুন জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই। যত বম গ্রাম রয়েছে অনেকেই এই সময়ে বন্দোবস্তি নিয়েছে। বম সমাজের ৫০ শতাংশ পরিবারের পাহাড়/ভূমি বন্দোবস্তি আছে বলা যায়।

১৯৫০ সাল থেকে বমরা হটিকালচারের দিকে সোৎসাহে মনোনিবেশ করে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রেও সাফল্য অর্জন করে। এই অঞ্চলের আনারস গুণে ও মানে উৎকৃষ্ট। কালুরঘাটস্থ মাল্টিপল জুস প্লান্টের কাচামালের পুরো চাহিদা পূরণের পরও খোলা বাজারে বিক্রির জন্য আনারসের স্তূপ লক্ষ করা যেত প্রতিটি পাড়ায়। ক্রমে ক্রমে ফলনে ভাটা পড়তে থাকে বাজারজাতকরণে বিস্তারিত সীমাবদ্ধতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণের কোন ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদির কারণে উৎপাদিত দ্রব্যের ন্যায্য দাম না পেয়ে চাষিরা নিরুৎসাহিত হতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যে অনভিজ্ঞতা, ভাষার সীমাবদ্ধতা ও সমতল এলাকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা, ব্যবসার নিয়মনীতি বা কলাকৌশল না জানা প্রভৃতির কারণে প্রধান অর্থকরী ফসল আনারস চাষের উৎসাহ ক্রমশ কমেছে। দ্রুত পচনশীল বলে এই ব্যবসায় ঝুঁকিও অনেক।

উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফলনের গুণগতমান বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগের চেষ্টা বা উদ্যোগও নেই, পৃষ্ঠপোষকতাও নেই। আরেকটা কথা, যেসব পরিবার ফল চাষ করছে তাদের সবার নিজস্ব পাহাড় বা বাগান নেই। পাড়াপড়শী এবং কাছের আত্মীয় স্বজনদের পাহাড়গুলো তারা ভাগাভাগি করে থাকে। প্রতি পরিবারের গড়ে ৫ একরের বেশি বন্দোবস্তি নেই। সেই ৫ একরের সব পাহাড়ও আবার চাষের উপযুক্ত নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভূমি খাড়া অথবা এবড়ো-থেবড়ো শিলাময় পাহাড় যা চাষের উপযুক্ত নয়। কম মূল্যবান গাছগাছালি, ছোট ছোট বাঁশ ও তার সাথে লতাগুল্ম ছাড়া এইসব জায়গায় কিছুই উৎপাদিত হয় না। চূপচাপ, সল্লবাক, শান্তিপ্রিয় ও গোটানো স্বভাবের বম লোকেরা কখন যে ব্যবসা-বাণিজ্যিক লেনদেনে পদচারণা করবে! রাজ্যের লজ্জা, সংকোচ যেন তাকে ঘিরে রেখেছে। অন্যের জন্য নিজেদের সে গুটিয়ে নিয়ে ছাড় দিয়ে নিরপেক্ষ থাকে বা অন্যকে জিতিয়ে দেয়।

সমবায়ের ভিত্তিতে এই জড়তা কাটিয়ে উঠা যায়। প্রয়োজন উদ্যোগের। জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধিওয়ালা হাতে গোনা কয়েকজন বম নেতৃবর্গ আছেন এ বিষয়ে তাদের মনোযোগ দেওয়া অতি জরুরি। বম আদিবাসীরা ৮০ ভাগ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। তবে বাংলায় নয়। ইংরেজী বর্ণমালায় মিশনারিদের প্রবর্তিত পদ্ধতিতে অবলীলায় বম শব্দগুলো লেখা যায়। সমবায়ের শিক্ষাদান ও পরিচালনায় এই অবস্থা খুবই সহায়ক হবে। তা ছাড়া বর্তমান প্রজন্মের সবাই বাংলায় লেখাপড়া করে। দুয়েকটি বাদ দিলে প্রতি বম গ্রামেই হয় সরকারি নয় নিজেদের উদ্যোগে স্কুল রয়েছে।

## ৫. ধর্মীয় অবস্থা

আদিবাসী বম জনগোষ্ঠী এককালে জড়োপাসক ছিল। জড়োপাসক বম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভূত-প্রেত, ঝাড়-ফুক, মন্ত্র-তন্ত্র, ওঝা-বৈদ্য, জ্যোতিষবিদ্যার প্রতি বিশ্বাস ছিল। বমরা খৃষ্টিং-পাথিয়ানকে বিধাতা পুরুষ মানে, তিনি স্রষ্টা, তিনি কখনো কষ্ট হন না, তিনি সদা কল্যাণময়ী। তাই বমদের খৃষ্টিং বা পাথিয়ান এর প্রতি পূজা, যজ্ঞ, বলিদান, অর্ঘ্য নিবেদন কিছুই করতে হয় না। কেননা তিনি কারো অমঙ্গল করেন না। যত পূজা, যজ্ঞ, অর্ঘ্য নিবেদন করা হয় সবই অপদেবতার উদ্দেশ্যে। কারণ যত অকল্যাণ, জুরা, ব্যাধি-মত্ব, ফলন হানি, খরা-অনাবৃষ্টি, প্রাণ, মহামারি সবই তাদের কীর্তি। তাদের তুষ্টি বিধানের জন্যই যত পূজা, অর্চনা যজ্ঞ-বলিদান, অর্ঘ্য নিবেদন আবেদনের আয়োজন করা হয়। তদুদ্দেশ্যে হরেক রকমের বিচিত্র নিয়মকানুনের মাধ্যমে যে পূজা অর্চনা বলীদান তারই নাম 'বলশান' (Bawlsan)। সমস্ত বলশানে'র পুরোহিত্য করেন 'বলপু' (Bawlpu)। ১৯১৮ সন হতে বম জনগোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়াতে বর্তমানে এদের ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক রীতি-নীতিতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বমদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন জুম চাষকে কেন্দ্র করেই 'বলশান' পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ের কোন না উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পূজা-পার্বণগুলো আয়োজন করে থাকে তারা। নীচে তার দুয়েকটি বর্ণনা দেওয়া হলো।

**ক. খুয়া-টেম (পাড়া শুদ্ধি) :** খুয়া টেম বা পাড়া শুদ্ধি বমদের অতি গুরুগম্ভীর অত্যাৱশ্যকীয় অনুষ্ঠান । পাড়া/গ্রামের কল্যাণ কামনায় খুয়া-টেম বা পাড়া শুদ্ধি অনুষ্ঠান পালন করা হয় । পাড়ায় অসুখ ব্যামো, জুমেৱ ধানের শীষ সাদাটে হওয়া, ভুট্টার গাছ বা কুমড়ার লতা লিকলিকে শীর্ণকায় থাকা, এসবই হয়ে থাকে 'জল খুরী' অপশক্তিৱ কারণে । সে পাড়ায় আস্তানা গাড়ার কারণে হয়ে থাকে যত অকল্যাণ, অসুখ-পীড়া, জরা মৃত্যু আর ফসলহানি! এই অপশক্তি বিতাড়নের মহা আয়োজনেরই হলো পাড়া শুদ্ধি বা খুয়া-টেম । গ্রাম শুচিকরণ অনুষ্ঠানে পাড়ার শিশু, নারী পুরুষ যুবক সকলের অংশগ্রহণ অত্যাৱশ্যক ।

গ্রামের লোকেরা নাম জানা, না জানা বিবিধ বৃক্ষের শিকড়, বাকল, লতাগুলো, আধপোড়া খড়ি, কয়লা,নানান রকম হাড়ের টুকরা, মাটির হাড়ির ভাঙ্গা টুকরা সংগ্রহ করে পাড়ার মধ্যস্থানে সমান জায়গায় স্তুপ করে রাখে । লতাগুলো, গাছের শিকড়-বাকলগুলো কুচি কুচি করে কাটে । হলুদ চুনা মিশ্রিত পানি ছিটিয়ে মিশ্রণগুলোকে রঙিন করে নেয় । এই মিশ্রণ পাড়াময় ছিটানো হয় মানুষের ঘরে, মুরগির ঘরে, গোলাঘরে, টেকিশালায়, গোয়ালঘরে, ঘরের মাচার নীচে, পোকার গর্তে, মাটির ফাঁক-ফোকরে সর্বত্রই ।

পাড়ার 'বলপু' পুরোহিত মশাই মিশ্রণের এক মুঠি হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করে-----

‘পাড়ার যত অকল্যাণের আখড়া তুই, নাম তোর কি জানিনা,  
তোর আস্তানা ঠিক কোন গর্তে জানি না ----কাঁকড়ার গর্তে?  
গাছের ফাঁক ফোকরে ? ছনের চালের কোন কোণায়? নাকি  
কোন মানুষের নাকের কানের গর্তে? যেথায় ঠাই নিস না  
কেন আজ তোরে বিদায় । যা, দূর হ, ঐ দূর পর্বত শৃঙ্গে যা,  
পূর্ব কি পশ্চিম উত্তর বা দক্ষিণ তোর তো সীমাহীন অস্থানা,  
সেথায় যা না ।

মঙ্গল প্রার্থনার পর নারী-পুরুষ চুন এবং হলুদের ভাড়ে চুবান রঙিন করা ফিতা কেউ হাতে, কেউ গলায়, কেউ কানে পড়ে । এ ফিতা এক গুণ্ডাহ গায়ে রাখার নিয়ম আছে ।

বেলা প্রায় পড়ে এল গ্রামের চারিদিকে ডাকাডাকি, খোজ-খবর করা হয় । এ সময় প্রতিটি নরনারীর গ্রামে ফেরা চাই । নয়তো ভোগান্তি আছে । পাড়ার সব বাড়ির লোক গণনা করা হয় । পাড়ার বাইবে আর কেউ নেই এটা নিশ্চিত হবার পর চার হাত লম্বা বাঁশের ফালি দিয়ে রামধনুর মতো করে পুঁতে পাড়ার সকল প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়া হয় । এরপর পাড়ার কোনো লোকের বাইরে যাওয়ার নিয়ম নেই, ভিন গ্রামের লোকদের প্রবেশেরও নিয়ম নেই । অনুষ্ঠানের রাত আর তার পরের দিন বাইরের সাথে গোটা গ্রামবাসী বিচ্ছিন্ন, সংযোগবিহীন হয়ে থাকতে হবে । গ্রামের কারো বাড়ির উঠানে, আঙিনায় বা চালে এক টুকরো কাপড় টাঙানো থাকতে পারবে না । কারণ কোনো কাপড়-চোপড় বিশেষ করে মেয়েদের পরিধানের বস্ত্র ঘরের বাইরে থাকলে তা এই 'পড়াশুদ্ধি' বা গ্রাম শুচিকরণ অনুষ্ঠানকে অকার্যকর করে দেয় । এই খুয়াটেম বা পাড়াশুদ্ধির দিনে দৈনন্দিনের হরেক রকম কার্যাদিও নিয়মমাফিক সম্পন্ন করতে হয় । বিশেষ রীতিতে অতি সতর্কতায় ঝরনার পানি তুলতে হয় । পিঠে করে লাউয়ের খোলে পানি আনার সময়ে কারোর পিঠ বা কাপড় ভিজলে খুয়াটেম বা পাড়াশুদ্ধি অনুষ্ঠানকে অকার্যকর করে দেয় ।

পাড়ার সকল নারী-পুরুষ সেই অপশক্তি বিতাড়নের মহৌষধি মিশ্রণ যে যার থুরুং এ ভরে নেয় । সবার হাতে থাকে একখানা শলা ঝাড়ুর মতো ফালি ফালি করা প্রায় এক হাত লম্বা বাঁশ । এবার পাড়াময় মিশ্রণ ছড়াও । হৈ হৈ রৈ রৈ চিৎকারসহ বাঁশের ঠোকাঠুকি, প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালে সজোরে আঘাত, আর সমস্বরে আওয়াজ তোলা হয়, 'দূর হ, দূর হ ।' পাড়ার মাথায় শেষ হয় মিশিলটি । এরপর থুরুংগুলো আর বাঁশের ঝাড়ুগুলো উল্টো করে স্তুপ করে রেখে সবাই যে যার বাড়ি চলে যায় । এবার সব কোলাহল বন্ধ । পাড়াময় নীরবতা আর নিস্তব্ধতা । সেই রাত্রি আর পরের দিনের জন্য কোনো কথা বলা নিষিদ্ধ । ততক্ষণে সূর্যদেব অন্ত গিয়েছে, পড়ে থাকে চুপচাপ নিথর সাড়াশব্দহীন গোটা গ্রাম । এই অরণ্যের প্রায় সকল আদিবাসী সমাজের কাছে 'পাড়াশুদ্ধি' এক অতি গুরুগম্ভীর অত্যাৱশ্যকীয় অনুষ্ঠান । এর অবশ্য নির্দিষ্ট দিন-মাস নেই, সমাজে বয়ে যাওয়া বিচিত্র ঘটনাপঞ্জি এবং প্রকৃতির খেলাই এ পর্বের নির্ধারক ।

এই আরণ্যেকরা যার প্রসন্নতা সাধন এবং তুষ্টি বিধানে ব্যস্ত ও ব্যাকুল, সেই শক্তি থাকে কাঁকড়ার গর্তে, পাহাড়ি ঝরনার উৎস মুখের সেই সঁাতসঁতে পাহাড়ের খাদে, জুমেৱ আগুনে আধ পোড় ঝাওয়া বৃক্ষের ফাপড় বা গর্তে, চুলার মুখে, শিলা পাথরের গুহায়, এ যে সর্বব্যাপী । তাই এদের তুষ্টি বিধানের জন্য হরেক রকমের আচার-প্রথা, পর্বাদি এই আরণ্যে করা পালন করে ।

**খ. লৌ খিং কুং বল (জুম মঙ্গল পূজা) :** এক জুমবছর অনেক হাসি কান্নার স্মৃতিতে ভরা । যে জুম তাকে সারা বছরের আহাৱ পানীয় যুগিয়েছে, সুস্বাস্থ্য দিয়েছে সেই জুমেৱ আত্মা মালিকের পিছু ছাড়ে না তিন বছর । সেই জুমেৱ প্রতি অকৃতজ্ঞ বা অবহেলা করলে তার অমঙ্গল হয় । তাই জুমেৱ আত্মার সন্তুষ্টির বিধান বাঙ্কনীয় । জুম পূজা/অনুষ্ঠান হলো জুমেৱ আত্মার সন্তুষ্টি সাধন । জুম মঙ্গল পূজার আগের দিনে

পাড়ার মেয়েরা টেকিতে ধান ভানে, বিনি ধানের পিঠা বানিয়ে রাখে। পুরুষরা খুব ভোরে উঠে জুমে যায়। সারা জুম পথে চালের গুড়া ছিটাতে ছিটাতে যায়। জুমে পৌছলে জুমের জন্য জঙ্গল কাটার প্রথম দিনে একটি গাছের নীচে যে পাথরটি মাটির নীচে পুঁতে রাখা ছিল তা খুঁজতে থাকে।

সেই গাছ এবং পাথর খুঁজে পাওয়া খুব সহজ কাজ নয়, সারা দুপুর চলে যায়। পাথরটি খুঁজে পাওয়া মাত্র সকলেই আনন্দে চিৎকার দিয়ে উঠে এবং জুমের মাটি কপালে মাখে। সেই পাথরটি যেখানে জুম আলুর গর্ত আছে তার পাশে লম্বা-লম্বিভাবে পুঁতে রাখে, তার পাশে একটি মারফা ও একটি বাঁশের চোঙ্গাও পুঁতে। পুঁতে রাখা পাথরের উপরে চালের গুড়া ছিটায়। মোরগ অথবা শূকর কেটে বলি দেয়। মাংসগুলি পূজার ডালায় নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে

‘কোথায় সব তোমাদের বসতি চিনি না জানি না, কাঁকড়ার গর্তে?

গাছের ফাঁকে-ফাঁকরে? পাথরের গর্তে? জুমের কোনো প্রান্তে?

যেখানে থাকো বেরিয়ে এসো, এই দেখো তোমাদের উদ্দেশ্যে

আমাদের অর্ঘ্য। এই যে মারফা, এই যে দুই মুঠা শূকর, এই যে মোরগ,

এসো সন্ধি করি, আত্মীয় কুটুম করি, হৃষ্টপুষ্ট ধানের শীষ প্রার্থনা করি,

সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা করি।

পুঁতে রাখা পাথরটির চারিদিক বাঁশর বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখে, পূজার ঘরের মতো ঘর বানায়, তাতে ফল দেয়, আর কলা পাতা ও মোরগের পালক দিয়ে সাজিয়ে রাখে। তার মধ্যে কলা পাতায় করে রান্না করা মাংস, তরিতরকারি প্রভৃতি উৎসর্গ করে। আর কিছু কাঁচা মাংস কলার পাতায় বেঁধে ঘরে ফেরার পথে প্রতিটি গাছের গোড়ায় রেখে আসে। প্রতিটি গাছ যেন আরাধ্য দেবতা। তার পরের দিন জুমের মালিকের জুমে যাওয়া নিষেধ।

**গ. রুয়া-খা-জার (বৃষ্টির আহবান) :** রুয়া-খা-জার হলো জুমের ফসল ভালো হওয়ার জন্য বৃষ্টির কামনা। অনাবৃষ্টি খরা হলে তাদের জীবন বপন হবে, ফসল তোলা যাবে না। অপদেবতার কোপদৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এবং অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রুয়া-খা-জার-এর আয়োজন করা হয়। প্রতি পূজায়/অনুষ্ঠানে উপচার বা জীব বলি অত্যাাবশ্যক হলেও এই বৃষ্টি আহবান অনুষ্ঠানের জন্য কোনো জীব বলি অত্যাাবশ্যক নয়, এর জন্য নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ নেই। জুমের আগাছা, লতাগুল, জঙ্গল পরিষ্কার শেষে কোনো একদিন বৃষ্টির কামনার জন্য একটি দিন ঠিক করে নেয় তারা। এই বিশেষ দিনে তারা ফসল ভালো হওয়ার জন্য বৃষ্টি কামনা করে প্রার্থনা করে।

মেয়েরা অতি ভোরে ঝরনার পানি আনতে যায়। পানির পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা লাউ-এর খালের মুখ অতি যতনের পাথরে ঘসে ঘসে পরিষ্কার করে। থুরুং এর মধ্যে অতি সতর্কতার সাথে একটার উপর আরেকটা বসিয়ে দেয় যাতে উল্টিয়ে গিয়ে পানি পড়ে না যায়। এটিও যেন একটা শিল্প। উচু নীচু পাহাড়ি পথে উঠা নামার সময়ে থুরুং এ সাজানো পানির পাত্রগুলো সূক্ষ্মভাবে থাকা চাই। যাদের পিঠ ভিজে যায়, সারা পথে যার পানির জন্য পাহাড়ি পথ পিছলিয়ে দেয় তার যথেষ্ট দুর্নাম হয়। পুরুষেরা বাড়ির চারিদিকের জঙ্গল পরিষ্কার করে, মাচাং ঘরের নীচে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে। ঘরের নীচে দিয়ে বৃষ্টির পানি যাতে না যায় তার জন্য নালা কাটে। ঘরের সিঁড়ি মেরামত করে, প্রয়োজনে গাছ/বাঁশ পাল্টিয়ে দেয়। জীব বলি না থাকায় এই রুয়া-খা-জার-এ আনুষ্ঠানিকতা নেই।

বর্তমানে বম, পাংখুয়া এবং লুসাইরা একশত ভাগই খ্রিস্টিয়ান। তাদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। ভারতের মণিপুর ও মিজোরামের একই ভাষাভাষী স্বগোষ্ঠীয় লুসাইরা বমদের কাছে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করেন। তারা ভারতের মণিপুর রাজ্যের চুরাচাঁদপুর (Churachandpur) এ অবস্থিত নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া জেনেরাল মিশন সংক্ষেপে (NEIG Mission) এ চাকরি করতেন। এই মিশন তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে মিশনারির কাজে প্রেরণ করে। স্থানীয় লোক প্রেরণের পূর্বে এক আমেরিকান মিশনারি (Rev. Rowland Edwin) সাহেব ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে এতদঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। বম সমাজে খ্রিস্ট ধর্ম শিক্ষা, চার্চ প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণের প্রধান ভূমিকা পালনকারী স্বর্গীয় পাস্টর এইচ ডালা’র (Pastor H Dala) সন্তানেরা বম সমাজের নেতৃত্বস্থানে আজ প্রতিষ্ঠিত। তাদের অনেকেই আজ শিক্ষকতা, ধর্ম শিক্ষা এবং সমাজ সেবায় নিয়োজিত।



## ৬. ভাষা, লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য

### ৬.১ ভাষা ও বর্ণমালা

বমদের নিজস্ব ভাষা আছে। খ্রিস্টান মিশনারি আসার আগে বম ভাষায় কোনো বর্ণমালা ছিল না। ১৮৯৪ সালের দিকে দু'জন খ্রিস্টান মিশনারি রোমান হরফ অনুসরণে নতুন বর্ণমালা তৈরি করেন। এখন বম ভাষায় বেশ কয়েকটি বই ও একটি মাসিক পত্রিকা রয়েছে।

বম আদিবাসী কুকি-চিন ভাষাভাষী মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভূক্ত। খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমনের পূর্বে বম, পাংখুয়া, লুসাই, তথা মিজো/জৌ ভাষায় কোনো বর্ণমালা ছিল না। (Rev. J. H. Lorrain and Rev. F.W. Savidge) খ্রিস্টান মিশনারিদের আইজলে আসেন ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। তারা রোমান বর্ণমালা অনুসরণে বর্ণমালা প্রবর্তন করেন। তা দিয়ে বাইবেলের অংশ, ধর্মীয় শিক্ষার পুস্তিকা, অভিধান ইত্যাদি বের করেন। মিজোরাম থেকে আগত লুসাই ধর্মপ্রচারকগণ এই বর্ণমালা বম-পাংখুয়াদের মধ্যে প্রচলন করেন। এই একই বর্ণমালা বম-পাংখুয়ারা ব্যবহার করে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়গুলোতে যখন বম পাংখুয়ারা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে তখন থেকে এই বর্ণমালার ব্যবহার শুরু হয়। প্রথমাবস্থায় লুসাই ভাষার বাইবেল, ধর্মীয় সংগীত ব্যবহৃত হতো। পাংখুয়ারা এখনো লুসাই ভাষার (মিজো ভাষা) বাইবেল ব্যবহার করে। বমদের নিজস্ব ভাষায় পবিত্র বাইবেল অনূদিত হয়েছে। বাইবেল ছাড়াও ধর্মীয় সংগীত, বাইবেলের ব্যাখ্যাসহ ধর্মীয় পুস্তিকা এবং অন্যান্য বেশ কয়টি বই পুস্তিকা বম ভাষায় রয়েছে। ইভাঞ্জেলিকাল খ্রিস্টিয়ান চার্চ কর্তৃক প্রকাশিত (Kawhmi Arfi) নামক মাসিক পত্রিকা রয়েছে। বম ছাত্র সংগঠন 'বম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' জির কুং সাহ কর্তৃক সম্পাদিত লাই-ইংরেজি অভিধান বের করেছে। বম ছাত্র সংগঠনের 'মেনরিহয়' নামে বার্ষিক ম্যাগাজিন রয়েছে।

বর্ণমালা পরিচিতি প্রাথমিক বই (Bawm Premier) পারিবারিক উদ্যোগে অথবা গির্জা অথবা পাড়া, সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় শিশুদের পড়ানো হয়। ভালো কথা যে, বম সমাজের শতকরা আশি জন নিজ ভাষায় লেখাপড়া জানে। চিঠিপত্র, লেনদেন, হিসাবপত্র, সভা সমিতির কার্যবিবরণী, নথিপত্র তথা সামগ্রিক সামাজিক যোগাযোগ বম ভাষায় সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে বম সমাজ অনেকখানি এগিয়ে আছে।

### ৬.২ লোকসঙ্গীত

বমদের লোকসংস্কৃতিবিশেষ স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বমদের অনেক প্রাচীন গাথা রয়েছে। বম আদিবাসীদের সমাজ জীবনে তাই এতো গান। এমন কোনো লৌকিক উৎসব আচার অনুষ্ঠান নেই যেখানে নৃত্যগীত নেই।

নান দু থু সিম লাহ উ

নান দু লা সাক উ

মিনতি করি কহিও না কথা

গাহিও গান পরান ভরিয়া

প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রাণের আর্তি, বিরহ ব্যথা, দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা, সমাজের মানুষের মনের কথা, প্রেম ভালোবাসা, মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই প্রকাশ পায় সংগীতে। প্রেমিক প্রেমিকার বিরহ বেদনা, প্রেম-অনুরাগ, সখ্যতা আদান প্রদান হয় সুরের মাধ্যমে। 'বিরহ'(এক প্রকার এক তারা) 'মিমীম' (ধানের নাড়া দিয়ে তৈরি বাঁশি) আর 'জলপাল' (এক প্রকার বাঁশি) বাজিয়ে সুর সৃষ্টি হয় তাতে বিরহ বেদনা ও বিচ্ছেদের ব্যথা মূর্ত হয়ে উঠে। কথা নেই আছে শুধু সুর। আছে এক সহজ-সরল আবেদন।

### ৬.৩ লোকনৃত্য

**ক. রোখা (বাঁশ নৃত্য) :** বম আদিবাসীদের সমাজ জীবনে আনন্দোৎসবের চেয়ে শোকানুষ্ঠানের প্রাধান্য লক্ষণীয়। রোখা নামে বিখ্যাত নৃত্যগীত আনন্দের নয় শোকানুষ্ঠানে হয় কারোর অপঘাত মৃত্যু, প্রসবজনিত মৃত্যু অথবা অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এই নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হয়। শোকাক্ত পরিবারের বাড়ির উঠানে সমান জায়গায় যুব-যুবা, প্রবীণ, বৃদ্ধরা সকলেই সমবেত হয়। এই নৃত্যগীতে যুবক যুবতীরা সাধারণত অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা করে। নিজেদের মধ্যে অনুনয় বিনয় আর এক রকম জোরাজুরিতে অবশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করে। জোড়া জোড়া লম্বা বাঁশের দুই প্রান্তে আড়াআড়িতে দুবার উপরে নীচে, দুবার পাশাপাশি অর্থাৎ একবার ফাঁক এবার চাপা ঠোকাঠুকিতে ছন্দতাল সৃষ্টি হয়। যখনই ফাঁক পড়বে সুচারু পদক্ষালন করে বৃত্তের আকারে যুবক যুবতীরা নেচে নেচে ঘুরে যায়। পার্শ্বে উপবিষ্ট অন্যরা তখন

গান গেয়ে চলে । বিরহ বিধুর একটা করুণ সুর এই গানে ধ্বনিত হয় । বিচ্ছেদের ব্যথা মূর্ত হয়ে উঠে । ছন্দে ছন্দে বাঁশের ঠোকাঠুকি আর হালকা চপল গানের সুর শোকের পরিবেশকে হালকা করে । শোকাক্ত পরিবারকে সাধুনা দান ও সাহচর্য দেওয়া এই নৃত্যগীতের মূল বিষয়বস্তু ।

বম :

রোখা তলা হেন  
আয় খালান,কান, পু লু চু,  
থলান মেন্ আ রল মান রী লৌ হেন;  
কায় হয় মান লৌ না রেঃ লান্

রোখা তলা হেন  
লুংতিয়াম আ কিয়াম, মান রী লৌ  
কাথাই কীর মেন্ কীর মেন্ কীর মেন্  
কা রুণ আল মুন লৌ হি তেঃ

রোখা তলা হেন  
কান জুয়াত মায়সিয়ল্ নু বাং আয়  
কায় হয় থলা মী কা হয় থলা মী  
খয়ানু নিঃ আ তেলই তির তুয়ান ।

রোখা তলা হেন  
তিলিম মার ঙৌ কী ঠা খী,  
মাল সম্ মানলৌ না রেঃ লান  
লেই দায় তাং দাঙ না যাওয়ে ।

বাংলা:

পিতামহের মরদেহ মাটিতে যায় নাই মিলিয়া  
নয়ন জুড়িয়া তোমায় না দেখিতেই  
চলিয়া গেলে আমায় ছাড়িয়া ।

মনে সাধ পুরিল না রে বধু  
ওগো বধু ফিরিয়া এসো ফিরিয়া এসো  
ঘর যে আমায় বড় শূণ্য লো ।

সোহাগী গয়ালরে যেমন রাখিতাম আদরে

নয়ন ভরিয়া দেখিতাম দিবানিশি যাহারে  
বিধাতা ছাড়াইয়া নিল তুরা করি ।

চেয়ে দেখো সোহাগী গয়ালটির শিং দু'টি  
আসছে পার্বন-উৎসবে উঠিব যে মাতি  
শুয়ে রইলে যে নরম মাটির কোলে ।

## সাধারণ্যাই

কোন বিত্তবান লোকের স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজিত আনন্দ উৎসব । এতে সব গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করে থাকে । আয়োজক গৃহস্থের শৌর্য বীর্য খ্যাতি গুণকীর্তনই এ অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু । গৃহস্থের বাড়ির আগ্নিনায় নারী-পুরুষ হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকারে একবার সামনে একবার পেছনে ধীরগতিতে তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে । এদের মধ্যে এক মূল গায়ন গানের মধ্য দিয়ে আয়োজক বিত্তবানের বীর রসাত্মক কাহিনী পরিবেশন করে আর অন্যরা ধুয়া তুলে ।

## লাদৌ বা বর-লা

সফল শিকারীর আনন্দ উল্লাসের গীত । শিকারলব্ধ বন্যজন্তুর মাথাসমেত গ্রামের প্রবেশ দ্বারে উচ্চৈরবে উদ্ধত ভঙ্গিতে আক্ষালন সহকারে যে বীররসাত্মক গীত গাওয়া তাকে লাদৌ বা বর-লা বলা হয় । খ্যাতিমান শিকারী তার শিকারলব্ধ জন্তুর মাথা উচুতে ধরে বিজয়ের গীত গায় আর সঙ্গীরা ধুয়া তুলে ।

Vawmkhuai c a kap lo tin c  
Val mc tluangkhwang lah u c  
Kan phun c al tlingtc sawn thlai c  
Kan lei ri ah nak c

Ka khup c, ka hawi val rual lakah khin c,  
Leng c a leng hen hawng ka zoh u law,  
tlang ah e leisawng bang ring zil c zel hen dah ka suak e.

## বাংলা:

ওহে যদি শস্যের ভালুক নাই ফেলেছো  
কিসে তোমার দর্প আক্ষালন  
তাকিয়ে দেখো ঐ যে যশমান শিরোমণি  
আমি চলি চুড়ায় চুড়ায় ।

## সিয়া কী দেং

সিয়া কী দেং বা শিং নৃত্য মৃতদের স্মরণোৎসব । অতি ব্যয়বহুল ভোজ উৎসব । কেবল যশমান মৃতলোকের স্মরণার্থে এই নৃত্যানুষ্ঠান হয়ে থাকে । জীবৎকালে তার যশ, খ্যাতি ও নানান সু-কীর্তি পরিবেশন করাই শিং নৃত্যানুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু । অংশগ্রহণকারী সকলই পুরুষ । মাথায় পাগড়ীসহ উত্তম পোষাক পরিধান করে একক অথবা সমবেতভাবে নৃত্য পরিবেশন করে । এই নৃত্যে বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন ।

শিং জোড়া হাতে নিয়ে প্রথমে সামনে, উচুতে, পিছনে এবং বাঁ পা উচু করে জাগিয়ে, একইভাবে ডান পা উচু করে জাগিয়ে ফাঁকে শিং দুইটি ঠুকঠাক বাজায়, আবার এক পা অপর পায়ের সাথে জড়িয়ে হাটু মাটিতে না লাগিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে নিতম্ব মাটিতে বাজিয়ে আবার উচিয়ে শিং দুটির ঠুকঠাক তালে তালে এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এই নৃত্যে শারীরিক সক্ষমতা এবং বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন হয়। এই নৃত্যে গীত হয় না।

**সালু লাম (Salu lam)**

গৃহের সম্মুখ দেয়ালে সারি সারি সাজানো বন্যজন্তুর মাথা/কঙ্কালগুলো জীবৎকালে অন্তত একবার শুচীকরণ বিধেয় নয়তো পরকালে হস্তার জন্য এরা হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এরকম বিশ্বাসের জন্য ‘সালু লাম’ এর আয়োজন। রীতি অনুযায়ী শুচীকরণ সম্পন্ন হলে তারা গৃহকর্তার বশীভূত হয়। সে উদ্দেশ্যে দেয়াল থেকে সব মাথাগুলো নামানো হয়, দাঁত, চোখ যোয়াল, শিং, মাথার খুলি, দাঁতের কপাট, একে একে ধুয়ে মুছে ফকফকা করা হয়। অনেক দিন রৌদ্রে, বৃষ্টিতে অথবা অবহেলায় ঝুলে থাকায় নড়বড়ে হয়ে যাওয়া অংশগুলোকে দড়ি বেত দিয়ে পোক্ত বাঁধা হয়। এরপর গুরু হয় নৃত্যানুষ্ঠান। জন্তুর মাথা দুই হস্তে উচ্চ উত্তোলন করে ডানে বাঁয়ে ঘুরিয়ে নাচিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিমায় পদক্ষালন ও বাহুশক্তি প্রদর্শন পূর্বক আত্মপ্রসাদমূলক নিম্মোক্ত গীত গায়। এই নৃত্যগীতে পৌরুষের স্পর্শ অনুভব করা যায়। The following is a song sung by a brave hunter as he boasts to others.

tui sum van zoh u le  
ti na e van rial ruah zui e  
Ka ral e andawhpa ram a tuan e  
A lung her ko sele e !

**Free translation:**

Looking to and from, albeit I am going against the stream  
And mus: endure the torrents of rain which the heavens disgorge upon me  
Still with a steadfast aim I keep to the hun:  
Isn’t a call for a duel for any body!

**বিয়ের গান (Lawi la)**

নিচে বিবাহ উৎসবের গীত পরিবেশন করা হল :

Nem ziarmar leilak bak a tum,  
Tuandawh senchiarnu tusun chu,  
A lungtum valpa run in sung,  
Tuanrel lai ka rel lai lai.  
Thunawnt  
Um bang ei ruang khat um u law,  
Fang bang ei kau khat um u law,  
Dawh te na run tuan rel u law.

A ke kar dindian a mawi e,  
Awihrial thi lai tla a ngawngah,  
Seitimh a hawinu lu chungah,

A kawmhruah nih a dung an zul.

A dungmai ah renu relpa,  
A lai ah senchiarnu mo nu,  
tuandawh senchiarnu a lawi e,  
A duh valpa in lei a lawi e.

বাংলা:

ধীর পায়ে সিঁড়ি নামে ঐ রূপসী কন্যা  
চলিছে আজি রিনিঝিনি  
বাঁধিবারে ঘর প্রাণবন্ধুর ।  
লাউ যেমন ধরে এক লতায়  
ধান যেমন আসে এক শীষেতে  
বাঁধিয়ো ঘর এক হৃদয় বৃন্তে ।  
চরণ ফেলিয়া যায় কন্যা ধিকি ধিকি  
জোড়া পুঁতির মালা গলায় ঝনঝনিয়  
পিছে পিছে তার সখি দল  
আগে সখা পিছে সখা  
মধ্যে রূপকন্যা রূপখানির মেলিয়া  
চলিছে আজি মনমানুষের কাছে ।

### ৬.৫ লোকসংগীত

লোক সংগীতের মধ্যে অনেক শ্রেণীর গান রয়েছে । যেমন- কাইলেক, লা ফিং, লা তুং । লাফিং বা লা তুং গান বৈচিত্র্যে মাধুর্যেও ভাবে সমৃদ্ধ । এটি মূলত ভাব প্রধান গান । এ গান বিষয়, ভাব, রস আর সুরের দিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ।

### ৬.৬ রূপকথা ও লোককাহিনী

বম জনগোষ্ঠীর রয়েছে নানান রূপকথা, পুরাকাহিনী, লোকাহিনী, গীতিকা ও নৃত্যগীত । এগুলো যদি সংগ্রহ করা যায় তাহলে লোকসাহিত্যের ভা-রও সমৃদ্ধ হবে । এইগুলোর মধ্যে আদিবাসীদের সমাজ, তাদের জীবনযাত্রা এবং জীবিকার চিত্র দেখতে পাওয়া যায় । বম আদিবাসীর নানান পুরাকাহিনী, লোকজ কাহিনী, প্রবচন, ছড়া, গীতিকা ও সৃষ্টি তত্ত্বকথা ইত্যাদি হারিয়ে যাচ্ছে । বম ভাষায় এই জাতীয় লিখিত কোনো গ্রন্থ নেই । এইগুলো সংরক্ষণ করা দরকার । এগুলোতে বম সমাজের কঠোর জীবনসংগ্রাম, ব্যক্তি ও সমাজজীবনের গভীর যজ্ঞাণা, নিঃসঙ্গতা, বৈষম্য, নৃশংসতা ও মহানুভবতার চিত্র নিখুঁতভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে । ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগাড়ের জন্য উদয়াস্ত কঠোর শ্রমসাধ্য জুম চাষ ও বন্য জন্তু শিকারের চিত্র অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে বারংবার উপস্থাপিত হয়েছে জীবন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি হিসেবে ।

### ৭. শিক্ষা

শিক্ষা ক্ষেত্রে বমরা বেশ অগ্রগামী বলা হলে অত্যুক্তি হবে না । পার্বত্য বান্দরবান জেলার প্রথম বিএ পাশ একজন নবম । তিনি প্রয়াত লাল নাগ বম । ১৯৫৬/৫৭ খ্রিস্টাব্দে রুমা উপজেলা সদর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের খামংখাং মৌজায় আর্থা পাড়া নামক স্থানে একটি ইংরেজি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগামীতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে । বমদের উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলোতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে । প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বমদের লেখাপড়া মোটামুটি ভালো, কিন্তু উচ্চ শিক্ষায় নয় । বমদের সাধারণভাবে শিক্ষার হার ৪০% ধরা যায় ।

## ৮. নারীর অবস্থা

বম জনগোষ্ঠী পুরুষতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোতে পুরুষের একচ্ছত্র প্রভাব থাকলেও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পুরুষরা নিজেদের পরিবারের নারীদের জড়াতে বাধ্য হয়ে পড়ে। নারীরা কেবল পরিবারের উপার্জনমূলক কাজে জড়িত থাকলেও ক্রমশ তারা গৃহস্থালি কর্মকাণ্ড-র দাসসুলভ গণ-পেরিয়ে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিজেদের সম্পৃক্ততাকে ত্বরান্বিত করতে থাকে। ফলে পারিবারিক গণ-র মধ্যে নারীরা চলাফেরা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা চর্চায় জড়িয়ে পড়ে।

তুলনামূলকভাবে অশিক্ষিত ও প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী বম পরিবারসমূহের নারীরা পারিবারিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে। অপরদিকে শিক্ষিত এবং উন্নত এলাকায় বসবাসরত বম পরিবারের নারীরা যথেষ্ট এগিয়েছে। বম জনগোষ্ঠীর নারীরা দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনাকাটা, নিজের ও সন্তানের অসুখে চিকিৎসা, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং গর্ভাবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবাসহ নিজেদের ও সন্তানের পোশাক পরিচ্ছদ কেনাকাটা হতে শুরু করে বাপের বাড়ি কিংবা গ্রামের বাইরে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষদের সাথে প্রায়ই সমভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। অপরদিকে পরিবারের বিভিন্ন সম্পত্তি ও ফসল ক্রয়-বিক্রয়সহ ছেলেমেয়েদের বিয়েতে নারীতে সীমিত পরিসরে মতামত রাখতে পারলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়ে থাকে। শিক্ষা ও সচেতনতার কারণে বমদের পারিবারিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের সম্পৃক্ততা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলেও এখনো পুরুষের প্রাধান্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।

বম সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড- নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের গতিও অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অতীতে বম সমাজের নারীরা গৃহস্থালি কাজের পাশাপাশি তাঁত বস্ত্র তৈরি, পশুপালন ও জুম চাষাবাদের কর্মকাণ্ড- জড়িয়ে ছিল। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি চাকরিসহ বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও মুদি ব্যবসায় নিজেদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত রয়েছে। ফলে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিজেদের সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়ও বম সমাজের নারীরা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করার সক্ষমতা অর্জনের গতিশীলতা অব্যাহত রেখেছে।

অন্য সমাজের মতো বম সমাজেও পুরুষরা যেমন নারীদেরকে অবলা হিসেবে মনে করে এবং প্রথাগত কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করে, ঠিক তেমনিভাবে নারীরাও নিজেদের স্বকীয় স্বাধীন চিন্তা চেতনার প্রয়োগ করতে পারে না। এভাবে পুরুষের ইচ্ছা বা মর্জি মারফত নারীদের কাজ করার প্রবণতার ফলে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর উপর নানা বৈষম্য বিরাজমান রয়েছে।

### বম সমাজে ‘ইনকাইসিয়াহ’/‘লেক্‌খাম’ (lengkham)

সমাজসিদ্ধ নিয়মে একজন বিবাহিত স্ত্রী তার স্বামী হতে ভরণপোষণের অধিকারী হয়। একজন বম নারী বিবাহের পূর্বে বা পরে স্বামীর সংসারে কিংবা পৈতৃক অথবা মাতৃকসূত্রে কিংবা তার আত্মীয় কর্তৃক দান বা উপহার হিসেবে কিংবা ষ্টুপজিত অর্থে সম্পত্তি ক্রয় অথবা লাভ করতে পারে। বিবাহের পূর্বে অর্জিত কোনো সম্পত্তির উপর আইনত নিরক্ষুশ মালিকানা স্বত্ব ও অধিকার স্ত্রীর থাকে। স্বামী নিষ্ঠুর প্রকৃতি হলে, স্ত্রী শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করলে, স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের কারণে সতীনের সাথে একসঙ্গে সংসারে অবস্থান বা বসবাসে অসম্মত হলে, সেক্ষেত্রে প্রথমা স্ত্রী স্বামীর ভিটায় নিরাপদ অবস্থানে থেকে স্বামীর নিকট হতে ভরণপোষণ লাভের অধিকারী হয় অথবা বম সোশ্যাল কাউন্সিল বা সার্কেল চিফ বা প্রচলিত আদালতের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তে পিড়ালয়ে অবস্থান করে স্বামী নিকট হতে খোরপোষ লাভের অধিকারী হয়। বিবাহের পর স্বামী বৈবাহিক সম্পর্কে অগ্রাহ্য বা অব্যাহত না রাখলে অথবা ভরণপোষণ প্রদানে বিরত থাকলে স্ত্রী তার দাম্পত্য সম্পর্ক ও দাবি পুনরুদ্ধারের জন্য বম সোশ্যাল কাউন্সিল বা আইনত সার্কেল চীফসহ দেওয়ানি আদালতে মামলাকরার অধিকার রাখে। স্বামীর দ্বিতীয় বা একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রী আপত্তি করার অধিকার রাখে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি পুরুষত্বহীন বা নপুংসক হলে অথবা দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে কিংবা মানসিক ভারসাম্যহীন হলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী বম সোশ্যাল কাউন্সিল বা সামাজিক আদালত বা প্রচলিত আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারী হয়।

### ৯. রাজনৈতিক সংগঠন

পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এবং জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোতে বম জনগোষ্ঠী সম্পৃক্ততা কাজিষ্কৃত মাত্রায় নয়। ফলে বম জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া তেমন আশানুরূপভাবে এগোয়নি। সঙ্গত কারণে বম জনগোষ্ঠীর যেমন নিজস্ব রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে উঠেনি, ঠিক তেমনিভাবে ত্বরান্বিত হয়নি তাদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াও। থানা ও সদরে কিংবা কাছাকাছি এলাকায় বসবাসকারী বম জনগোষ্ঠী থেকে কতিপয় ব্যক্তির আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এবং জাতীয় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সাথে সম্পৃক্ততা লক্ষণীয় হলেও তাতে রাজনৈতিক সচেতনতার মাত্রা সম্পর্কে আশাবাদী হওয়ার তেমন কোনো অবকাশ নেই।

১৯৯৭ সালে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রবর্তিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদে অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মতো বম জনগোষ্ঠীরও আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে বম, লুসাই ও পাংখোয়া জনগোষ্ঠীর জন্য ১টি সদস্যপদ সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে বম, লুসাই, পাংখোয়া, খুমী, চাক ও খিয়াং জনগোষ্ঠীর একটি সদস্যপদ সংরক্ষিত রয়েছে। তবে এসব জনগোষ্ঠীকে একত্রে আঞ্চলিক পরিষদে একমাত্র একটি সদস্যপদ এবং বান্দরবান জেলা পরিষদে একটি সদস্যপদ সংরক্ষণ করার ফলে বম জনগোষ্ঠী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত নয় বলে অনেকের অভিমত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বম জনগোষ্ঠীসহ এসব স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ অন্তর্গত একটি করে আসন এবং অনুরূপভাবে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদেও সংরক্ষণ করা উচিত বলে অনেকে অভিমত প্রদান করেন।

#### টীকা :

1. Bonzu (Buchanan, 1798), Banjoogee (Masea, 1801), Bunjoos (Barbe, 1845), Boun-jus Ges Bounjwes (Phayre, 1845)
2. Lewin, Mackenzie, Way, Riebeck, Hutchinson, Miles, Levi Strauss, Bessaignet, Bernots), Banjogis ev Banjogies (Barbe), Bawm, Bawm-Zo (Lorrain, 1940), Bom-Laejo Ges Bom (Bernots), Bom-Zou (Löffler, 1959), Bonzogi Ges Bom-(Sopher, 1964), Bawm (Wolfgang Mey, 1960), Avi Bom (Paramanik).

#### তথ্যসূত্র :

1. Vumson, Zo History, 1986
2. Rajput, A. B. the tribes of Chittagong Hill Tracts, Karachi, 1965
3. Hutchinson, R. H. S, An Account of Chittagong Hill Tracts, 1906
4. Bessaignet, P. Social Research in East Pakistan, Asiatic Society of Pakistan Publication, No. 5. (ed) Pierre Bessaignet 2<sup>nd</sup> Edition, 1964



# বিশ্বায়নের জোয়ারে আদিবাসীদের সংস্কৃতি সংরক্ষণের সমস্যা এবং ভবিষ্যত করণীয়

সিংইয়ং শ্রো

## ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বকোণে অবস্থিত একটি নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। প্রাকৃতিক বৈচিত্র, জনবৈচিত্র, জীববৈচিত্র, ভূ-বৈচিত্র ও জাতিবৈচিত্রের কারণে এই অরণ্যঘেরা পার্বত্যাঞ্চলের পরতে পরতে বৈচিত্র্যের ছাপ। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জনবৈচিত্র্য পার্বত্য অঞ্চলকে দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। প্রাকৃতিক এই রূপময়তার কারণে আগ্রহিজনের মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠতে সক্ষম। এ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে ভিন্ন ভাষাভাষি ১১টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। এরা হলোঃ চাকমা, মারমা, শ্রো, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, লুসাই, পাংখোয়া, খুমী, খেয়াং ও চাক। তাদের রয়েছে নানামুখি বৈচিত্র্যময় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক জীবন।

সংস্কৃতি হলো মানুষের আচরণের সমষ্টি। সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষ সমাজ থেকে যা কিছু অর্জন করে তাই সংস্কৃতি। কোন জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, বিশ্বাস, লোকগীতি, লোকনৃত্য, উৎসব-পার্বন, লোককাহিনী, কিংবদন্তি, খেলাধুলা, ভাষা-সাহিত্য, প্রথা-রীতি, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ইত্যাদি সবকিছুই সংস্কৃতির অংশ। অর্থাৎ একটি জাতির মূল শিকড় হচ্ছে সংস্কৃতি। যে জাতির সংস্কৃতি যতো বেশি সমৃদ্ধ হবে, সেই জাতি ততো বেশি পরিচিতি লাভ করতে পারে। ইয়েহুদি এ. কোহেনের মতে-‘সংস্কৃতি হচ্ছে, প্রকৃতির রাজ্যের মানিয়ে নেবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সংক্ষেপে বলতে গেলে সংস্কৃতি হচ্ছে একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীর যা কিছু করে, তার সব কিছুতেই বুঝায়।’ ই.বি টেইলরের মতে-‘সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের অর্জিত আচার-আচরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, রীতি-নীতি, প্রথা, আইন-কানুন ইত্যাদির জটিল সমাবেশই হল সংস্কৃতি।’

সংস্কৃতি একটি সম্প্রদায় তথা জাতি-গোষ্ঠীর নিজ সত্তাকে প্রকাশ করে। তাই নিজ নিজ সংস্কৃতি রক্ষা করা এবং তা পালন করা প্রত্যেক আদিবাসীর পবিত্র দায়িত্ব। সংস্কৃতির যা মঙ্গলকর, উন্নয়নমুখী এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এমন সংস্কৃতিকে রক্ষা করা অধিক প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, যে সংস্কৃতি আদিবাসীদের পিছনে টেনে ধরে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। বর্তমানে সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে আদিবাসীদের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে যা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির জন্য হুমকি স্বরূপ। আধুনিক যুগে দেশের বৃহত্তর সমাজের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির প্রভাবে আদিবাসীদের সংস্কৃতির চর্চা দিনে দিনে লোপ পাচ্ছে। বাংলাদেশের আদিবাসীদের সংস্কৃতির পরিবর্তনের শুরু হয় মূলতঃ উপনিবেশিক আমল থেকে। তবে তখন এ পরিবর্তন সীমিত পর্যায়ে ছিল। বিশ্বে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে শিল্পায়ন এবং আধুনিকায়নের জন্যই এ পরিবর্তন ঘটে আসছে।

পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের সংস্কৃতির শেকড় হলো অরণ্য ও প্রকৃতি। তারা অরণ্য ও প্রকৃতি থেকে গানের সুর ও নৃত্যের মুদ্রা খুঁজে নেয়। ত্রিপুরারা বৃক্ষের পাতার উপর বৃষ্টির পড়ার, হাতির পাল নদী পাড়ি দেওয়ার সময় পানি সাথে হাতির পায়ের আঘাতে সৃষ্ট শব্দ থেকে চংপ্রাইং (বেহালা) সুর; শব্দ থেকে বেহালা সুর সৃষ্টি করেছে। শ্রোরা বুনো কলাপাতা বাতাসে দোলে দেওয়ার দৃশ্য থেকে দেংরাম তিয়াপ (কলাপাতা দোলানো) নৃত্য সৃষ্টি করেছে। এক পরমা সুন্দরী মাচাং ঘরের ছায়াতলে আপন মনে পিনন বুননরত অবস্থায় একটি ক্ষুধার্ত বাঘ এসে সুন্দরীকে কামড়ে নিয়ে যায়। এ দৃশ্য ধারণ করেই মারমাদের বাঘের নৃত্য সূচনা। এছাড়াও আরো আদিবাসী রয়েছে, যাদের নৃত্যগীত সৃষ্টি হয়েছে জীব-জন্তু শিকারের কাহিনী নিয়ে। পশু-পাখি, জীব-জন্তুর আচার-আচরণও আকৃতি-প্রকৃতি থেকে। তাই এগুলো নিছক নৃত্যগীত নয়, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শিকড়। যেগুলোর মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এখনো আমাদের সাথে কথা বলেন। এইগুলো হারালে আমরা নিজেদের হারাবো।

## সংস্কৃতি সংরক্ষণের সমস্যার কারণসমূহ

আদিবাসীরা নানা কারণে তাদের সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ, চর্চা ও উন্নয়ন করতে পারছে না। ইচ্ছে থাকলেও অনেকে দরিদ্রতার কারণে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকতে পারে না। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাতে আর গান-বাজনা করার মানসিকতা থাকে না। অন্যদিকে আদিবাসীদের বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের যে উপকরণ বন উজাড় হবার কারণে তা দুস্প্রাপ্য হয়ে গেছে। তাছাড়া পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, আকাশ সংস্কৃতি ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে আদিবাসীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির চর্চায় পাল্লা দিতে পারছে না। আদিবাসীদের সংস্কৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মূল সমস্যাগুলো নিম্নরূপ :

## ১. বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি

দুঃজনক হলেও সত্য যে, বিশ্বায়ন ও আধুনিকায়নের জোয়ারে তথা ভিন্ন সংস্কৃতির প্রবাহে আদিবাসীদের লোকজ সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বিলীন হতে চলেছে। যা টিকে আছে তাও আজ বিলুপ্তির পথে। এখন মোবাইল ফোনে বোতাম টিপলে ভেসে আসে পাশ্চাত্য সংগীতের উত্তাল সুর। টিভি স্ক্রীনে ভেসে আসে রঙিন মিউজিক ভিডিও'র গান। এসবে আসক্ত হয়ে আমাদের নতুন প্রজন্ম ভুলে যেতে বসেছে আপন সংস্কৃতিকে। শুধু ভুলে গেছে বললে ভুল হবে, তারা নিজস্ব সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতেও শুরু করেছে।

## ২. চর্চার অভাব

আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত ও লোকবাদ্যযন্ত্র থাকলেও প্রবীণ প্রজন্ম ব্যতীত নতুন প্রজন্মের কাছে এসবের যেমন চর্চা নেই তেমনি আবেদনও নেই। বর্তমানে আদিবাসীদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও বিশেষ কোন উপলক্ষ্য ছাড়া কোন লোকসংগীত বা লোকনৃত্য পরিবেশন করতে দেখা যায় না। বরং ইদানিং এসব অনুষ্ঠানে ভিন্নদেশী সংগীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। অপরদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী লোকচিকিৎসা শাস্ত্র ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ এবং খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন এসেছে। আদিবাসী নারীদের মধ্যে পোশাকের ঐতিহ্য কিছুটা থাকলেও পুরুষরা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ছেড়ে আধুনিক পোশাক (প্যান্ট-শার্ট, ব্রেজার, কোট-টাই ইত্যাদি) পড়তে শুরু করেছে।

## ৩. বিদেশী সংস্কৃতি অনুকরণ

বর্তমানে আদিবাসীরা বিদেশী সংস্কৃতি অনুকরণ করতে তাদের নিজস্ব গৌরবময় ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। এর কারণে জীবনের মূল্যবোধও আমরা হারিয়ে ফেলছি। আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলেই অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে। অপসংস্কৃতি এখন সংস্কৃতির আসন দখল করে নিয়েছে। ফলে সত্য ও সুন্দরকে বিসর্জন দিয়ে তরুণরা আধুনিকতার জোয়ারে ভাসছে। বিদেশী বা অন্যের কোন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার আগে এর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে অপসংস্কৃতিকে রোধ সবার সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। বিদেশী সংস্কৃতিকে আমরা একবাক্যে অপসংস্কৃতি বলে থাকি। আসলে এটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। বিদেশী সবকিছুই অপসংস্কৃতি নয়। পাশ্চাত্য ধাচের পোশাক দেখে যদি আমরা আচ্ছন্ন হয়ে যাই তাহলে তা স্বাভাবিকভাবেই অপসংস্কৃতির অনুকরণ। এ কথাটিও সত্য যে, পুরনো সংস্কৃতিকে ধরে রাখাটাও এক প্রকার পিছিয়ে থাকা। এখনো দেখা যায়, যে জনগোষ্ঠী আদি ও লোকজ সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে তারা সভ্যতার আলো ছায়ার বাইরে রয়েছে। তবে আধুনিক সভ্যতার সাথে মানিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা, চর্চা ও উন্নতি ঘটাতে হবে।

## ৪. বাদ্যযন্ত্র তৈরির জন্য উপকরণ অভাব

বাদ্যযন্ত্র তৈরি করার জন্য বেশিরভাগ উপকরণ বন থেকে পাওয়া যায়। বনে নানা ধরনের বাঁশ, গাছ, লতা ও পাতা দ্বারা আদিবাসীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে। বর্তমানে বনে কোন গাছ-পালা, লতা-পাতা ও বৃক্ষ-গুল্ম না থাকায় আদিবাসীদের লোকবাদ্যযন্ত্র তৈরি করার জন্য উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী অনেক লোকবাদ্যযন্ত্র হারিয়ে যেতে বসেছে। আর অনেক বাদ্যযন্ত্র হারিয়ে যাওয়ার বা পিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পথে। শ্রো আদিবাসীদের পুং (বাঁশি) তৈরি করার জন্য জঙ্গলে নারিকেল জাতীয় সাদা গাছ মাতামুহুরী ও সাদা রিজার্ভ ফরেষ্ট ছাড়া এখন আর কোথাও নেই। এই গাছের বাকল বা ছাল দিয়ে বাঁশির রিদ তৈরি করা হয়। বর্তমানে এ গাছটি পর্যাপ্ত পরিমাণ না পাওয়ায় আগের মতো শ্রোরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পুং বাঁশি তৈরি করতে সমস্যা হয়ে পড়ে। যার ফলে আগের দিনের মতো এ ধরনের বাঁশি অহরহ পাওয়া যাচ্ছে না। আদিবাসীদের বেহালার তার হিসাবে ব্যবহারের জন্য যে পালা জাতীয় গাছটি ছিল তাও এখন আর নেই। বর্তমানে বেহালা তারের জন্য বাজারের যন্ত্রসংগীত দোকান থেকে ক্রয় করে ব্যবহার করতে হয়েছে। এর ফলে বেহালার আওয়াজে/ শব্দে যে আদিমতার ছাপ ছিলো তা আর হয় না। ওতাড়া ঢোল, বাঁশি, খ্রুংখ্রুংসহ আদিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র তৈরি করার জন্য যে সমস্ত গাছ-পালা ও বৃক্ষ-গুল্ম প্রয়োজন তা এখন আর নেই।

## ৫. দরিদ্রতা

আদিবাসীদের সংস্কৃতি সংরক্ষণে বাঁধার মধ্যে দরিদ্রতা মূল কারণ। সংস্কৃতির চর্চার উৎসাহ থাকলেও ঘরে খাবার না থাকলে তা বাস্তবে সম্ভব হয়না। গান-বাজনা নিয়ে থাকবে, নাকি আহার সংগ্রহে গাং থাকবে এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতে হয়। মনের গহীণে গান-বাজনা বাসনা থাকলেও পেটের ভেতর আহার না জমলে সংস্কৃতির চর্চা নিয়ে ভাবনাটাই আকাশ কুসুম হয়ে যায়। একজন দক্ষ শ্রমীও সারাদিন কাজ করার পর সংস্কৃতির চর্চার বাসনা জাগেনা।

## সংরক্ষণ ও করণীয়

উপরোল্লিখিত সমস্যাসমূহ সঠিকভাবে সমাধান করতে হলে সচেতন এবং সক্ষম ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে। আদিবাসীর লেখক, গবেষক, সাংস্কৃতিককর্মীসহ সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির অনুকরণ পরিহার করে স্থায়ী সংস্কৃতিকে ধারণ ও বরণ করতে হবে। ভবিষ্যতে আদিবাসী সংস্কৃতিকে আরো উন্নতি ও সফলতা অর্জন করতে হলে নিম্নলিখিত করণীয় বাস্তবায়ন করা সমীচীন।

১. নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণে নিজেদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান দেখা যায় লোকনৃত্য, লোকসংগীত ও লোকবাদ্যযন্ত্র শিল্পী বেশির ভাগই বয়স্ক। এ থেকে বুঝা যায় নবীনরা এসব বিষয়ে জানে না বা জানার আগ্রহ নেই। তাই আমাদের লোকসংস্কৃতিকে রক্ষা ও পুনরুদ্ধার করতে হলে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষুদ্রাকারে হলেও সাংস্কৃতিক ক্লাব তৈরি করে লোকসংগীত, লোকনৃত্য ও লোকবাদ্যযন্ত্র প্রশিক্ষণ ও চর্চা ও সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রবীণরা গত হলে এসব লোকসংগীত প্রশিক্ষণে আর সুযোগ থাকবে না।

২. আদিবাসীদের লোকবাদ্যযন্ত্র তৈরি করার জন্য যে সমস্ত গাছ-পালা, লতা-গুল্ম প্রয়োজন তা জঙ্গল থেকে এনে প্রয়োজেনবোধে বাগান সৃজনের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে। দক্ষ কারিগর এবং বাদ্যযন্ত্র শিল্পীদের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে বাদ্যযন্ত্র তৈরি ও বাজানো প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৩. বাদ্যযন্ত্র, লোকসংগীত, লোকনৃত্য ও লোকনট্য প্রশিক্ষণের জন্য এলাকা ভিত্তিক অথবা জেলার মধ্যে একাডেমি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেখানে আদিবাসীদের লোকসংগীত, লোকনৃত্য ও লোকনট্যসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সেখানে মিনি জাদুঘর অথবা আর্কাইভ স্থাপন করেই আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোকনট্য, পোশাক-পরিচ্ছদসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপকরণ-সরঞ্জাম ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যাবে। সম্ভব হলে আদিবাসীদের লোকসংগীত অডিও এবং ভিডিও করে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী শিল্পীদের মধ্যে প্রতিভা বিকাশের জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নাটক মঞ্চায়ন ও বিভিন্ন প্রদর্শনী আয়োজন করতে হবে। বিভিন্ন টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলের সাথে যোগাযোগের করে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়মিত সম্প্রচারের উদ্যোগ নিতে হবে।

৫. ব্যাপক অনুষ্ঠান আয়োজন, প্রতিভা অন্বেষণ, কার্যক্রম নিবিড় প্রশিক্ষণ ও চর্চাকে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন। তিন পার্বত্য জেলা শিল্পীদের নিজেদের মধ্যে সংস্কৃতি বিনিময় মূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে এবং দেশের বাইরেও আদিবাসী সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করতে হবে।

৬. আদিবাসীদের ভাষায় রচিত লোকসাহিত্য, নাটক, ছড়া, কবিতা, গল্প-আখ্যান, উপকথা, কিংবদন্তি প্রভৃতি বিলুপ্তির পথে, তা সংগ্রহ করে প্রকাশনা, চর্চা, প্রচার ও সংরক্ষণ করতে হবে। আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণা ও রক্ষার জন্য সুশীল সমাজ ও সংস্কৃতিকর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে।

## উপসংহার

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রে ও ভৌগোলিক সীমা রেখায় সীমাবদ্ধ। তাই নিজের সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বড় রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সমাজ ও সংস্কৃতিকে গতিশীল, কার্যকরী এবং উন্নয়নমুখী করার জন্য সুপরিচালিত পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এজন্যে প্রত্যেক আদিবাসীর একটি করে নিজস্ব সামাজিক ও সংস্কৃতির সংগঠন থাকা দরকার। কিন্তু তাদের মধ্যে এ ধরনের প্রয়াস সীমিত। ফলে বৃহত্তর সমাজ ও সংস্কৃতির তুলনায় আদিবাসীদের সমাজ ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল এখনো পিছিয়ে আছে। এ অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি লাভের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যমান প্রত্যেক আদিবাসী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। আদিবাসীদের সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সেই সঙ্গে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা দরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি রয়েছে। এগুলো একটি বাগানের ন্যায় হরেক রকম ফুলের সমাবেশে সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে উঠে। আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংস্কৃতি সংরক্ষণ করা এবং লালন-পালন করা প্রতিটি আদিবাসীর অপরিহার্য দায়িত্ব। তেমনি এই বৈচিত্রময় সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধি আনয়নে দেশের সাংস্কৃতিক নাগরিক এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহেরও দায়িত্ব রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীর সংস্কৃতি চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ও একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

# সংক্ষিপ্ত মেলা পরিক্রমা

১৩ম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা ২০১৪

জুম ঈস্‌থেটিক্স কাউন্সিলের আয়োজনে গত ৩, ৪ ও ৫ এপ্রিল ২০১৪ রাস্তামাটির ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে ‘১৩তম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা’ অনুষ্ঠিত হয়। ৩ এপ্রিল’২০১৪ বিকাল ৫ টায় মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন বিশিষ্ট লেখক চিত্রমোহন চাকমা, সাথে সাথেই বেজে ওঠে শিল্পীদের বাঁশি। এরপর শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান। আলোচনা অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার দেবশীষ রায়, চাকমা সার্কেল চীফ; মিঃ শামসুদ্দিন খান, চেয়ারম্যান, এ. কে. খান ফাউন্ডেশন; মায়ুনুর রশীদ, বরেণ্য নাট্যজন; শিশির চাকমা, বিশিষ্ট সংস্কৃতিকর্মী। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এ্যাড. মিহির বরণ চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি মিঃ বিমিত বিমিত চাকমা।

সন্ধ্যা ৬.৩০টায় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জাক সন্মাননা-২০১৪ প্রদান করা হয়। এ বছর সন্মাননা প্রদান করা হয়- সংস্কৃতিতে সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা (মরণোত্তর), সাহিত্যে বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও সুহৃদ চাকমা (মরণোত্তর)-কে। এ দিন সন্ধ্যা ৭ টায় শ্রো, ত্রিপুরা, খুমি ও খিয়াং সাংস্কৃতিক দল পরিবেশন করে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৪ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭ টায় তঞ্চঙ্গ্যা, পাংখোয়া, চাক ও মোনঘর সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। আদিবাসী সংগীত ও নৃত্যের মনোজ্ঞ পরিবেশনায় মেতে ওঠে ক্ষুনসাই প্রাঙ্গণ। একই সাথে ক্ষুনসাই মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় গুভাশিস সিনহা সম্পাদিত ও নির্দেশিত মনিপুরী নাটক ‘কহে বীরাজনা’।

৫ এপ্রিল সমাপনী দিনে সন্ধ্যা ৭ টায় অনুষ্ঠিত হয় চাকমা, বম, ত্রিপুরা ও মনিপুরী সাংস্কৃতিক দলের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা। এদিন একই সময়ে ক্ষুনসাই মিলনায়তনে জুম ঈস্‌থেটিক্স কাউন্সিল (জাক) প্রযোজিত এবং শান্তিময় চাকমা রচিত ও সুখময় চাকমা নির্দেশিত নাটক ‘দুলো পোদার দোলি নাজানা’।

# ১৪ তম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা-২০১৫

## অনুষ্ঠানসূচি :

### ■ ৮ এপ্রিল ২০১৫, বুধবার

- ⊙ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : বিকাল ৪.৩০ টা
- ⊙ উদ্বোধক : রেভা. এল. দৌলিয়ান বম, বিশিষ্ট সমাজকর্মী
- ⊙ স্বাগত বক্তব্য : মিঃ শান্তিময় চাকমা, যুগ্ম আহবায়ক, ১৪তম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা-২০১৫ পরিচালনা কমিটি
- ⊙ প্রধান অতিথি : প্রফেসর মং সানু চৌধুরী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
- ⊙ বিশেষ অতিথি : মিঃ জিরকুং সাহু, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক  
মিঃ মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, বিশিষ্ট লেখক ও উন্নয়নকর্মী
- ⊙ সভাপতি : এ্যাড. মিহির বরণ চাকমা, সভাপতি, জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)
- ⊙ সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য জাক সন্মাননা-২০১৫ : সন্ধ্যা ৬.০০ টা  
ডাঃ ভগদত্ত খীসা, বিশিষ্ট লেখক (মরণোত্তর)  
রেভা. এল. দৌলিয়ান বম, বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও সমাজকর্মী  
মিঃ সিংইয়ং শো, বিশিষ্ট লেখক
- ⊙ আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যা ৬.৩০ টা
- ⊙ পরিবেশনায় : বম, শো ও ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক দল

### ■ ৯ এপ্রিল ২০১৫, বৃহস্পতিবার

- ⊙ আদিবাসী কবিতা পাঠের আসর : ৫:৩০ টা
- ⊙ পার্বত্য আদিবাসী জীবনধারা : সন্ধ্যা ৬:০০ টা
- ⊙ আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যা ৬.৪৫ টা
- ⊙ পরিবেশনায় : বম, মারমা (জ্যে গীতিনৃত্য নাট্য), মোনঘর সাংস্কৃতিক দল

### ■ ১০ এপ্রিল ২০১৫, শুক্রবার

- ⊙ আদিবাসী কবিতা পাঠের আসর : ৫.৩০ টা
- ⊙ আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যা ৬.৩০ টা
- ⊙ পরিবেশনায় : তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, চাকমা সাংস্কৃতিক দল
- ⊙ চাকমা নাটক : সন্ধ্যা ৭ টা  
'ফিরিই'  
রচনা : ঝিমিত ঝিমিত চাকমা  
নির্দেশনা : ফয়েজ জহির ও ঝিমিত ঝিমিত চাকমা  
পরিবেশনায় : জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)

বিঃ দ্রঃ প্রতিদিন মেলা চলাকালীন সময়ে স্টল প্রদর্শনী, আদিবাসী জীবন ও কর্মভিত্তিক স্থিরচিত্র প্রদর্শনী, আদিবাসী বেতশিল্প ও আদিবাসী খাদ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

## মেলা পরিচালনা কমিটি

আহবায়ক	: এড. মিহির বরণ চাকমা
যুগ্ম আহবায়ক	: শান্তিময় চাকমা
সদস্য সচিব	: তরুণ চাকমা
যুগ্ম সদস্য সচিব	: ডাঃ গঙ্গামানিক চাকমা
সদস্য	: বিমিত্ত বিমিত্ত চাকমা
সদস্য	: শিশির চাকমা
সদস্য	: মৃত্তিকা চাকমা
সদস্য	: মানস মুকুর চাকমা
সদস্য	: হীরালাল চাকমা
সদস্য	: প্রীতিময় চাকমা
সদস্য	: বীর কুমার চাকমা
সদস্য	: মিহির কান্তি চাকমা
সদস্য	: সুশীল বিকাশ চাকমা
সদস্য	: সুখেশ্বর চাকমা পন্টু
সদস্য	: পঠন চাকমা
সদস্য	: অশোক চাকমা
সদস্য	: অরুণ কান্তি চাকমা
সদস্য	: সুখময় চাকমা চৌ
সদস্য	: সিয়ং খুমি
সদস্য	: কীর্তিলংকার চাক
সদস্য	: সঞ্চয় চাকমা
সদস্য	: পার্থ প্রতীম তালুকদার
সদস্য	: উচিংসা রাখাইন কায়েস
সদস্য	: রনেল চাকমা

### ১। অর্থ উপ-কমিটি :

আহবায়ক	: এড. মিহির বরণ চাকমা
সদস্য	: তরুণ চাকমা
সদস্য	: ডাঃ গঙ্গা মানিক চাকমা

### ২। যোগাযোগ উপ-কমিটি :

আহবায়ক	: বিমিত্ত বিমিত্ত চাকমা
সদস্য	: শিশির চাকমা
সদস্য	: সুখেশ্বর চাকমা পন্টু
সদস্য	: সিয়ং খুমি
সদস্য	: পিয়াচং শ্রো
সদস্য	: দয়াময় চাকমা টুকে
সদস্য	: রনেল চাকমা

### ৩। ক্রয় উপ-কমিটি :

আহবায়ক	: শিশির চাকমা
সদস্য	: এড. মিহির বরণ চাকমা
সদস্য	: মিহির কান্তি চাকমা
সদস্য	: হীরালাল চাকমা
সদস্য	: ডাঃ গঙ্গা মানিক চাকমা

### ৪। প্রকাশনা ও পোস্টার উপ-কমিটি :

আহবায়ক	: অম্লান চাকমা
সদস্য	: শিশির চাকমা
সদস্য	: মৃত্তিকা চাকমা
সদস্য	: রনেল চাকমা

### ৫। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপ-কমিটি :

আহবায়ক	: পঠন চাকমা
সদস্য	: বিমিত্ত বিমিত্ত চাকমা
সদস্য	: সচিব চাকমা
সদস্য	: শোভন দেওয়ান টিটু
সদস্য	: সঞ্চয় চাকমা
সদস্য	: বাচ্চু চাকমা
সদস্য	: সুব্রত চাকমা

### ৬। নাটক মঞ্চায়ন উপ-কমিটি :

আহবায়ক	: মৃত্তিকা চাকমা
সদস্য	: শান্তিময় চাকমা
সদস্য	: সুখময় চাকমা চৌ
সদস্য	: বীর কুমার চাকমা
সদস্য	: বিমিত্ত বিমিত্ত চাকমা

### ৭। অবকাঠামো নির্মাণ উপ-কমিটি :

আহবায়ক	: শিশির চাকমা
সদস্য	: বিমিত্ত বিমিত্ত চাকমা
সদস্য	: শান্তিময় চাকমা
সদস্য	: হীরালাল চাকমা
সদস্য	: প্রীতিময় চাকমা
সদস্য	: অরুণ কান্তি চাকমা

### ৮। আবাসন ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি :

আহবায়ক	: অশোক চাকমা
সদস্য	: নির্মল চাকমা
সদস্য	: অর্ণব দেওয়ান উজ্জল
সদস্য	: সুনির্মল চাকমা চুংকু

### ৯। খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি :

আহবায়ক	: মিহির কান্তি চাকমা
সদস্য	: সুশীল বিকাশ চাকমা
সদস্য	: কীর্তিলংকার চাক
সদস্য	: অশোক চাকমা
সদস্য	: শশীরণ চাকমা

### ১০। প্রচারনা (আমন্ত্রণপত্র বিলি, ব্যানার, মাইকিং, পোস্টারিং, বেইজ প্রস্তুতকরণ) উপ-কমিটি :

আহবায়ক	: সুখেশ্বর চাকমা পন্টু
সদস্য	: হীরালাল চাকমা
সদস্য	: উচিংসা রাখাইন কায়েস
সদস্য	: করুণাশীষ চাকমা চুংকু
সদস্য	: সুনেন্টু চাকমা
সদস্য	: লাল্টুময় চাকমা

<b>১১। উপস্থাপনা উপ-কমিটি :</b> আহবায়ক : সুখেশ্বর চাকমা পল্টু সদস্য : মানস মুকুর চাকমা সদস্য : রনেল চাকমা	সদস্য : সঞ্চয় চাকমা সদস্য : প্রিনা চাকমা সদস্য : সুনেন্দু চাকমা সদস্য : অল্লি চাকমা	সদস্য : সুনির্মল চাকমা চুংকু সদস্য : শান্তিময় চাকমা কল্লো সদস্য : কলেজের ছাত্রছাত্রী
<b>১২। স্টল বস্টন উপ-কমিটি :</b> আহবায়ক : ঝিমিত ঝিমিত চাকমা সদস্য : হিরালাল চাকমা সদস্য : আশীষ চাকমা সদস্য : রেমলিয়ানা পাংখোয়া	<b>১৬। অতিথি আপ্যায়ন উপ-কমিটি :</b> আহবায়ক : কীর্তিলংকার চাক সদস্য : তরুণ চাকমা সদস্য : সুভাষ চন্দ্র চাকমা বিণয় সদস্য : লাল্টুময় চাকমা সদস্য : ননাবী চাকমা	<b>২০। স্টল সামগ্রী সংগ্রহ উপ-কমিটি :</b> আহবায়ক : ঝিমিত ঝিমিত চাকমা সদস্য : শিশির চাকমা সদস্য : সুখেশ্বর চাকমা পল্টু সদস্য : সিয়ং খুমি সদস্য : পিয়াচং শ্রো সদস্য : দয়াময় চাকমা টুকে সদস্য : রনেল চাকমা সদস্য : জিংমুন বম সদস্য : সিমোই আমলাই
<b>১৩। শৃঙ্খলা উপ-কমিটি :</b> আহবায়ক : অরুণ কান্তি চাকমা সদস্য : ডাঃ গঙ্গা মানিক চাকমা সদস্য : সুভাষ চন্দ্র চাকমা বিনয় সদস্য : দয়াময় চাকমা টুকে সদস্য : জুরোধন চাকমা সদস্য : মুকেশ চাকমা সদস্য : কলেজের ছাত্রছাত্রী	<b>১৭। জ্বাক সন্মাননা প্রদান উপ-কমিটি :</b> আহবায়ক : শিশির চাকমা সদস্য : এ্যাড. মিহির বরণ চাকমা সদস্য : ঝিমিত ঝিমিত চাকমা সদস্য : মুস্তিকা চাকমা সদস্য : শান্তিময় চাকমা সদস্য : হিরালাল চাকমা সদস্য : তরুণ চাকমা সদস্য : ডাঃ গঙ্গা মানিক চাকমা	<b>২১। ডকুমেন্টেশন উপ-কমিটি :</b> আহবায়ক : সুব্রত চাকমা সদস্য : অম্মান চাকমা সদস্য : সঞ্চয় চাকমা সদস্য : উচিংসা রাখাইন কায়েস সদস্য : ঝিদিত চাকমা সদস্য : এনভিল চাকমা
<b>১৪। অভ্যর্থনা উপ-কমিটি :</b> আহবায়ক : এ্যাড. মিহির বরণ চাকমা সদস্য : শিশির চাকমা সদস্য : ঝিমিত ঝিমিত চাকমা সদস্য : শান্তিময় চাকমা সদস্য : মুস্তিকা চাকমা সদস্য : তরুণ চাকমা সদস্য : হিরালাল চাকমা	<b>১৮। দপ্তর ও তথ্যকেন্দ্র উপ-কমিটি :</b> আহবায়ক : হিরালাল চাকমা সদস্য : প্রিনা চাকমা সদস্য : সুনেন্দু চাকমা সদস্য : অল্লি চাকমা সদস্য : ননাবী চাকমা	<b>২২। বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি :</b> আহবায়ক : সুনির্মল চাকমা চুংকু সদস্য : উচিংসা রাখাইন কায়েস সদস্য : শান্তিময় চাকমা কল্লো সদস্য : অর্ণব দেওয়ান উজ্জ্বল
<b>১৫। জাকস্টল ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি :</b> আহবায়ক : হিরালাল চাকমা সদস্য : ডাঃ গঙ্গা মানিক চাকমা	<b>১৯। জাক পিঠাস্টল উপ-কমিটি :</b> আহবায়ক : কীর্তিলংকার চাক সদস্য : নিরোদবালা দেওয়ান	



## কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

- ১। চেয়ারম্যান  
এ. কে. খান ফাউন্ডেশন
- ২। শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা  
চেয়ারম্যান  
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ  
রাঙ্গামাটি।
- ৩। মিঃ বৃষকেতু চাকমা  
চেয়ারম্যান  
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ  
রাঙ্গামাটি।
- ৪। জেলা প্রশাসন, রাঙ্গামাটি।
- ৫। পুলিশ সুপার, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
- ৬। ফয়েজ জহির, বিশিষ্ট নাট্যজন।
- ৭। হেমল দেওয়ান, বিশিষ্ট সংস্কৃতি
- ৮। কল্যাণ মিত্র চাকমা, চট্টগ্রাম
- ৯। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি
- ১০। টংগ্যা, রাঙ্গামাটি।
- ১১। মোনঘর শিশু সদন, রাঙ্গামাটি।
- ১২। বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি
- ১৩। শ্রো সাংস্কৃতিক দল
- ১৪। বম সাংস্কৃতিক দল
- ১৫। থিয়াং সাংস্কৃতিক দল
- ১৬। পাংখোয়া সাংস্কৃতিক দল
- ১৭। ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক দল
- ১৮। মারমা সাংস্কৃতিক দল
- ১৯। খুমী সাংস্কৃতিক দল
- ২০। চাক সাংস্কৃতিক দল
- ২১। তঞ্চঙ্গ্যা সাংস্কৃতিক দল
- ২২। চাকমা সাংস্কৃতিক দল
- ২৩। মোনঘর সাংস্কৃতিক দল
- ২৪। উপজাতীয় কাঠ ব্যবসায়ী ও জোত মালিক কল্যাণ সমিতি
- ২৫। মেডিনেট ল্যাব এন্ড কনসাল্টেশন সেন্টার

রিনাফুং, ট্র, টিংটেন, শিঙায় বেজে উঠুক আদিবাসী জীবনের গান

■ Supported by : A. K. Khan Foundation